মানুষের গল্প

বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বাস সম্পাদিত

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ—১৩৬৯

মুদ্রক। শ্রীপ্রাণকুমার মুখার্জী
এস্ অ্যান্টনী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৯১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

যা আছে এখানে—

সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি

ক্যান্‌ভাস

ক্যান্‌ভাসে পেন্‌সিলের দাগে যে মুখটা আবারো ফুটে উঠছে, হয়তো বলা যায় একে ভেসে ওঠা, আইনগত এবং সামাজিক স্বীকৃতিতে সে আমার বউ। অর্থাৎ চন্দনা। গোল মুখ। অসম্ভব উজ্জ্বল দুটো চোখ। একটু মোটা ভ্রূ। কপালের ডানদিকে হাল্‌কা কালো একটা তিল। থুত্‌নিতে স্পষ্ট একটা ভাঁজ একদম মাঝ-বরাবর। আর··· আর···, না এছাড়া আর কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য, যা কিনা আর দশ লক্ষ মুখে নেই, নেই চন্দনার মুখে। ব্যাস্‌ এই। এই মুখটাই আবারো ভেসে উঠল ক্যান্‌ভাসে। আমার বউ-এর মুখখানা।

অথচ আমি কী আঁকতে চাইছি? আমার বউ-এর মুখাবয়ব আঁকতে চাইনি নিশ্চয়ই। তবে কী? কী আঁকতে চাই আমার ক্যান্‌ভাস জুড়ে? যতোদূর মনে পড়ছে, আসলে এই নোতুন ক্যান্‌ভাসটায় আমি হাত দিয়েছি—দিন পাঁচেক হয়ে গ্যালো। আমি জীবনানন্দের কবিতার সেই বিখ্যাত লাইনগুলো ধরতে চেয়েছিলাম। ঠিক কোন্‌ লাইনগুলো এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। হয়—

(১) অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ / যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দ্যাখে তারা / যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই / পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া। অথবা (২) সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে। / শত-শত শূকরের চিৎকার সেখানে / শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;

এইরকম কোনো লাইনই আমি ধরতে চেয়েছিলাম, ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম আমার ক্যান্‌ভাসে।

হলফ্‌ ক'রে বলতে পারি, আমার বউ-এর মুখাবয়ব আমি আঁকতে চাইনি ঐ ক্যান্‌ভাসটায়। সে আমি বহুবার বহুভাবে বহু কোণ থেকে এঁকেছি। এই দীর্ঘ ত্রিশ বছর। অর্থাৎ কিনা চন্দনার সঙ্গে পরিচয়ের

প্রথম দিন থেকেই ; প্রেমপর্বে, বিবাহ এবং বিবাহ উত্তর পর্বে, তারপর যেদিন প্রচণ্ড প্রসব যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছিলো চিৎকার করছিলো তখন, আমার মেয়ে রিয়ার প্রথম ঋতুপর্বে যখন আমার বউ ভীষণ দক্ষতায় অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যাবলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলো মেয়েকে— সেদিনও, কলেজে পড়াকালীন দীপকের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার অবধারিত ফলাফল অ্যাবর্শন্‌ করিয়ে রিয়া ফিরে এলে চন্দনার মুখের সেদিনকার সেই ছবি—আঃ আমি আর পারছি না। এই দীর্ঘ ত্রিশ বছরে আমি বহু ক্যান্‌ভাস ভরিয়েছি চন্দনার—স্রেফ চন্দনার মুখাবয়বে। ব্যোর হয়ে গ্যাছি। ব্যোর হয়ে যাওয়া মানে কি ঘেন্না ধ'রে যাওয়া বোঝায়! বোধহয় না। ক্যানোনা, আমি বুঝতে পারছি, চন্দনার প্রতি আমার ঘেন্না ধ'রে গ্যাছে—ব্যাপারটা এরকম নয়। আমি পরিষ্কার জানি, আমার বউ-এর প্রতি আমার কোনো ঘেন্না নেই। তবে ব্যোর হ'য়ে গ্যাছি আমি ওর ছবি আঁকতে আঁকতে।

সেদিন প্রলয় ছিলো আমার পাশে। পাশে বলতে আক্ষরিক অর্থেও পাশে বলা যায়। প্রলয়ই বলেছিলো—চন্দনার একটা ভালো পোর্ট্রেট আঁক্‌, আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসবো ওকে। তখন আমি প্রধানতই ন্যূডস্টাডি নিয়ে বিষম ব্যস্ত। এবং মাত্র কয়েকটাই কাজ করেছি ল্যাণ্ডস্কেপ্‌-এর ওপর। কিছু জলরঙে কিছু মিক্সড্‌ মিডিয়ামে। আমার বেশির ভাগ কাজই শুধুমাত্র পেন্‌সিল-স্কেচে। প্রলয়ের কথায়, হ্যাঁ উৎসাহিত বোধ করেছিলাম বৈকি সেদিন। এ্যাখন ভাবি, তা না হলে, চন্দনার ছবি আঁকতে আঁকতে আঁকতে আঁকতে ধীরে ধীরে এভাবে ব্যোর হয়ে যেতাম না নিশ্চয়ই আমি।

সেই শুরু চন্দনার মুখ ছ্যাখা। আমার নিজস্ব ক্যান্‌ভাসে। আমার নিজস্ব পেন্‌সিলে। ক্যান্‌ভাসের পর ক্যান্‌ভাসে শুধু চন্দনার মুখ। মুখাবয়ব, বি-টু ফ্রন্ট, বি-টু ব্যাক, বি-টু রাইট সাইড, লেফ্‌ট সাইড, বার্ড্‌স-আই-ভিউ……আঃ আমি আর পারছি না। আমি ব্যোর গ্যাছি। আমি ব্যোর হয়ে গ্যাছি। আমি আর পারছি না। সেই

চন্দনার মুখ আজো আবারো ফুটে উঠছে—ভেসে উঠছে আমার ক্যান্‌ভাসে। আমার পেন্‌সিল স্কেচে। আমার সেই চিরাচরিত একঘেয়ে বউ-এর মুখের ছবিই আমি ক্যামন য্যানো আমার অজান্তেই আবারো এঁকে ফেলছি সাদা ক্যান্‌ভাস জুড়ে। অথচ আমি চাইনি। অনেকেই বিশ্বাস করে, অনেকেই বিশ্বাস করছে। সবাই নয়। আমি এ ছবি আঁকতে চাইনি। আমি ধরতে চেয়েছিলাম জীবনানন্দের কবিতার লাইন।

● দুই

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যেও পার হতে চলেছে। দুপুর থেকেই সেই একইভাবে এক জায়গাতেই ব'সে আছে বিজন। তীব্র নীল রং-এর ট্রাউজার, সঙ্গে গেরুয়া পাঞ্জাবীর উপর নস্যি রং-এর চাদর জড়িয়ে ব'সে আছে বিজন। বারান্দার কোণের চেয়ারটায়। অন্তত সপ্তাখানেক দাড়ি কাটেনি ও। চুল উস্কোখুস্কো। অর্থাৎ বিষন্ন চেহারায়—মন খারাপ হয়ে যাওয়া চেহারা নিয়ে ব'সে আছে বিজন। এভাবে ওকে ব'সে থাকতে দেখলে বিরক্তি ধ'রে যায় চন্দনার। ভাল্লাগেনা। অথচ ওকে জিজ্ঞেস ক'রেই ফেললো—তোমার কি মন খারাপ?

বিজন কোনো উত্তর দিলো না। পরিবর্তে পাল্টা প্রশ্ন করে—ক্যানো বলো তো? সেরকম মনে হচ্ছে?

—তাহলে? শরীর ভালো আছে?

আবারো প্রশ্নই করে বিজন। এই একটা দোষ ওর। সহজে উত্তর দিতে চায় না। কোনো প্রশ্নেরই। প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করে। এ্যাখনো তাই করলো।—আমায় কি অসুস্থ দ্যাখাচ্ছে?

ধ্যাৎ! বিরক্তিকর!—বিরক্তি প্রকাশ ক'রেই ফ্যালে চন্দনা—তোমার কি কোনো প্রশ্নেরই জবাব জানা নেই? না, ইচ্ছে ক'রেই এড়িয়ে যাও? মন খারাপ নয়—শরীর খারাপ নয়—তাহলে এভাবে ব'সে আছো ক্যানো এ্যাতো দীর্ঘক্ষণ? ব'লেই পেছন থেকে দুহাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরলো ওর, দারুণ আদরে—কী হয়েছে তোমার?

আমার কিছুই ভালো লাগেনা চন্দনা,—বিজন বলে —কিছুই ভালো লাগেনা। কাউকেই ভালো লাগেনা।

কী ভালো লাগেনা?

কিছুই ভালো লাগেনা। কাউকেই ভালো লাগেনা।

আমাকে?—প্রশ্ন করতেই ন'ড়ে উঠলো বিজন। য্যানো মোক্ষম রকমের নির্বোধমাফিক এই প্রশ্নের জন্যই এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা বিজনের। এই দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধ'রে।

কলেজ-লাইফে কী অসম্ভব উচ্ছল ছিলো বিজন। সেই, প্রথম যেদিন চন্দনাদের ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটে এসেছিলো বিজন ...। সঙ্গে ছিলো প্রলয়।—ভালো তো আমারো লাগে না কিছু। আমি কি কখনো তোমায় বলেছি ত্যামন কিছু!

—তুমি সব ব্যাপারেই আমাকে হারিয়ে দিয়েছো চন্দনা। অভিনয়ে তো বটেই। বিশেষ ক'রে ভালো লাগানো আর ভালোবাসা তৈরির অভিনয়ে। আমি পারিনি। আমি পারিনা চন্দনা। আমি পারিনা। ক্যানোনা আমার সত্যি-সত্যিই কিছুই ভালো লাগেনা। কাউকেই ভালো লাগেনা। কাউকেই ভালো লাগেনা আমার। প্রলয়ের কথা ভাবি। দারুণ ভালো আছে প্রলয়। আসলে, হয়তো ভালো আছে। মানে আমার তাই মনে হয়। ওর কথা ভাবলেই।

আমি জীবনানন্দের কবিতার লাইন ধরতে চেয়েছি, আমার ক্যান্‌ভাসে। ধরতে পারিনি। ধরতে পারছি না। পেন্‌সিলের শিসে ফুটে ওঠে, ভেসে ওঠে বারবার সেই একই ছবি—একই মুখ, যা আমি আঁকতে চাইনা। আঁকতে চাইনি। যা আমি এই দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধ'রে এঁকে এঁকে ক্লান্ত। না, ঠিক ক্লান্ত নই। ব্যোর। ব্যোর হয়ে গ্যাছি আমি। আঃ আমি আর পারছিনা। একসময় পারতাম। একসময় আমি পারতাম, আমি পেরেছি সময়টাকে ধরতে-বুঝতে। এ্যাখন আমি পারিনা। আমি জানি, আমার উচিত এই ছিন্ন-ভিন্ন ছেঁড়া-খোঁড়া রক্তাক্ত সময়টাকে ধরা। পারছি না। আমার ক্যানো ভালো লাগছে

রীতা! আমার তো ভালো না লাগারই কথা। কিছুই। কাউকেই।
চন্দন! আবারো নির্বোধের মতো অথবা অসাধারণ বুদ্ধিমতীর মতো প্রশ্ন ক'রে বসে - রীতা কে ?

● তিন

ক্যান্‌ভাস ' ক্যন্‌ভাস। আমি সমস্ত ক্যান্‌ভাসগুলোকে ছিঁড়ে ফেলবো। আজ অবধি, না ঠিক হোলো না, এই দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধ'রে আমি যা ধরেছি আমার ক্যান্‌ভাসে, তার একটিও আমার আঁকা নয়। সবকটি এঁকেছে আমার পেন্‌সিল। আমার তুলি। সব ক্যান্‌ভাস আমি আবার—আবার নোতুন ক'রে আঁকবো। শুধু সময়ের ছবি আঁকবো। শুধু সময়ের ছবি। 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ' কিংবা 'শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর'।

*　　*　　*　　*

অন্ধকার স্টুডিওতে বিজন একা একা ঢোকে। লাইটটা জ্বালতেই বিস্ময়ের সঙ্গে ছাখে রিয়া সেখানে দাঁড়িয়ে। কী করছে রিয়া! এখানে একা দাঁড়িয়ে! ক্যানো! ওর চোখেই বা জল ক্যানো! কাঁদছে! ক্যানো! - বাবা দেখেছো তোমার সমস্ত ক্যান্‌ভাস সাদা। এ্যাতোদিন ধ'রে তুমি কিছুই আঁকোনি বাবা।

তুই এখানে কী করছিস ?

আমার কিছুই ভালো লাগেনা বাবা। কিছুই ভালো লাগে না। কাউকেই ভালো লাগেনা।

অমিত গুপ্ত

একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে গোলমাল

উলু আমার বাল্যবান্ধবী। ও যেদিন স্বেচ্ছায় চন্দ্রবদন মিত্রের বউ হ'ল সেদিন থেকে আমাদের কথা বন্ধ. ও নামের একটা লোককে যে বিয়ে করতে পারে তার রুচিকে ধিক্। সেই উলু আজ ঘোর সন্ধ্যায় আমাদের আড্ডায় এসে উপস্থিত। আমার পাশে চেয়ার টেনে ব'সে বলল—তোর কাছে এসেছি, পল্লব একা একা কিছু কথা বলতে চাই। নবীন, হৃদি আর আনোয়ার বলল—(১) ঠিক আছে। ঠিক আছে। (২) আমরা উঠছি। (৩) তোরা একা একা, থুড়ি, দোকা দোকা কথা বল।

আমি ওদের বাধা দিলাম—বস। এমন কি কথা থাকতে পারে যা তোদের সামনে বলা চলে না?

উলু কোলের ওপর হাত দুটো জড়ো ক'রে বারকয়েক মুঠো করল খুলল। আমি জানি এভাবে ও মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করে। তারপর পেছনদিকে মাথা হেলিয়ে উঃ শব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এতে আমি বেশ আনন্দ বোধ করছিলাম। ওর এই চেহারাটা ফাইন। তিরিশ সেকেণ্ড ছটফট ক'রে উলু মুখ খুলল—একান্ত প্রাইভেট কথা হাটে বাজারে বলা যাবে না। আমি একজনের সঙ্গেই কথা বলতে চাই। তোদের চারজনের মধ্যে যে কোন একজন। কে আমার সঙ্গে আসবি আয়। আনোয়ার···

অগত্যা আমাকেই উঠতে হ'ল—ঠিক আছে, চল, কোথায় যেতে হবে?

—জাহান্নামে।

আমরা মহানন্দার পাড়ে গিয়ে বসলাম। উলু জিজ্ঞেস করল
—আমাকে দেখতে কি ভয়ানক কিছু একটা মনে হচ্ছে?
—না তো
—অথচ দেখ চাঁদু আমাকে
—চাঁদু মানে চন্দ্রবদন? ওকে তুই চাঁদু বলিস? বিচ্ছিরি শোনায়। তারচে' পুরো নামে ডাকা ভাল
—আমার বরকে আমি কি নামে ডাকব এ নিয়ে তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে আসিনি পল্লব। বিপদে পড়েছি। সাহায্য চাই। নিরুপায় মানুষ মানুষের কাছে যায়। তোর কথাই প্রথম মনে হ'ল কেননা তারচে' কাছের কাউকে দেখছি না। সমস্যাটাও এমন যে পাঁচ কান করা চলবেনা। চাঁদু আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাকে মিশাইল ব'লে ডাকতে শুরু করেছে।
—ঠাট্টা বা আদর হতে পারে।
—ঠাট্টা করতে ও জানেনা। খুব বেশি আদরে উলুখাগড়া ডেকে থাকে। ওই একটাই শুনেছি।

উলুখাগড়া শুনে আমার গা রি রি করছিল। যাই হোক অতিকষ্টে জিজ্ঞেস করলাম—তা মিশাইল ডাকতে এত উদ্বেগ বোধ করছিস কেন?
—করব না? এটা স্বাভাবিক আচরণ? কয়েকবার মিশাইল ডাকার পর আমার সন্দেহ হ'ল। ওর চোখে টর্চ ফেলে দেখলাম। টকটকে লাল। হিংস্র। আমার বোধ হয় সর্বনাশ হ'ল পল্লব।
আমি ওকে সান্ত্বনা দিলাম—থাক থাক। ও রকম টর্চ দিয়ে চোখ দেখতে যাস না। ভয় পাওয়ার কিছু নাই। যত হিংস্র হোক কব্জা ক'রে দেব।
—তা তো করবিই। সেই জন্যই আসা। তারপর আমার হাত থেকে টর্চ কেড়ে নিয়ে পাপোষের ওপর ঘুমন্ত বেড়ালের মাথা টিপ ক'রে মেরে দিল।
—একেই বোধ হয় বেড়াল মেরে বউ বাধ্য রাখা বলে।

—ছ্যাবলামো ছাড়। আমার জীবন-মরণ সমস্যা। মন দিয়ে শোন। চাঁত্বর বংশে পাগল আছে। এক পুরুষ পর পর। ওর কাছেই শুনেছি। ওদের ঠাকুরদার ভাই পাগল ছিলেন। সেই পাগলের পিসিও পাগল।

—হায় উলু. বড় দেরি হয়ে গেল। এ সব খোঁজ-খবর আগেই নিতে হ'ত। উলু ফোঁস ক'রে উঠল—তার মানে? কি বলতে চাস তুই? কারো প্রেমে পড়তে তার বংশে পাগল আছে কিনা জেনে নিতে হবে? ই-সি-জি, ব্লাড, স্পুটাম, স্টুল, স্ক্যানিং, সোনোগ্রাফি, সুগার টেস্ট রিপোর্ট নিয়ে তবে হুঁ বলতে হবে? এ রকম ধ্যান ধারণার জন্য কোন দিন কিছু হ'ল না তোর। শোন আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয় আমিও পাগল হব। একসঙ্গে পাগলা গারদে থাকব। তোদের মুখ দেখাতে আসব না। ম'রে যাব।

আমি সান্ত্বনা দিলাম - না না উলু। ঘাবড়ে যাস না। যেটুকু বললি তা পাগলের লক্ষণ হিসেবে যথেষ্ট নয়। আজ সারাদিন যা যা করেছে সমস্ত খুলে বল। তোদের একান্ত প্রাইভেট কিছু থাকলে বাদ দিয়ে। শোনার পর চন্দ্রবদনকে দেখতে যাব। তারপর আমার জানা একজন পাগলের ডাক্তার আছেন তাঁর কাছে নিয়ে যাব।

উলু কিছুটা আশ্বস্ত হ'ল—পল্বল, বেড়াল মারার পর থেকে ব'লে যাচ্ছি। শুধু আমার নাম নয় নিজের নামও ভুলে গেছে। কাজপাগল লোক। রাতে করবে ব'লে অফিস থেকে ফাইল নিয়ে এসেছিল। তাতে কী সব অদ্ভুত মন্তব্য লিখে সই করেছে কমাণ্ডার স্টেফান ব'লে। কত ডাকলাম চাঁদু ও চাঁত্ব সাড়াই দিচ্ছে না। অফিসে না গিয়ে আজ সারাদিন ফোনের পাশে ব'সে আছে পেণ্টাগণ হেড কোয়ার্টার থেকে মেসেজ আসবে ব'লে। থেকে থেকে কী সব বলছে, পাসওয়ার্ড গ্র্যাড কিনডন, কোড সেভেন সেভেন ফাইভ, পেট্রিয়ট, নাপাম, বাংকার, ক্রশপয়েণ্ট, হিটট্রেসার এই সব। ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ফুলদানিতে কাল কিছু ফুল রেখেছিলাম। ঘুঁষি মেরে ফেলে দিয়েছে।

ফুলগুলি পায়ের নিচে, আঃ পল্বল, পায়ের নিচে পিষে পিষে পেস্ট বানিয়েছে।

এরপর উলুর সঙ্গে ওদের ফ্ল্যাটে গেলাম। কিছুদূর থেকে দরজা হাঁ করে খোলা দেখে উলুর স্বর আশংকায় কাঁপতে থাকল—হা ভগবান। একা রেখে গেছি। চলে যায়নি তো কোথাও!

না যায়নি। দেয়ালে পেন্সিল দিয়ে কিছু আঁকছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমরা ওর পিঠ দেখতে পাচ্ছি। উলু কাছে গিয়ে মৃদু স্বরে ডাকল—চাঁদু। কোন জবাব পেল না। ওকে খুব বিব্রত দেখাচ্ছিল। আমি মেঝেতে পা ঠুকে ডাকলাম—কমাণ্ডার স্টেফান। চন্দ্রবদন তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং ঘুরে একটা স্মার্ট স্যালুট। উলু আর্ত চিৎকার ক'রে উঠল—না না পল্বল। ও নামে নয়।

আমি বললাম—ঠিক আছে। চন্দ্রবদন, চিনতে পারছ?

—গুড ইভ্‌নিং স্যর। অপারেশন থ্রি এক্স সাক্‌সেসফুল। ছবিগুলি পরিষ্কার এসেছে। প্রেসে রিলিজ করার জন্য রেডি করছি। এই দেখুন, চন্দ্রবদন দেয়ালের দিকে দেখাল। যোগ চিহ্নের মাঝখানে শূন্য। পাশে লেখা থ্রি এক্স। —এই সেই বাংকার। তিন মিটার পুরু কংক্রিট। তিনশ মাইল দূর থেকে ছুটে এসে একেবারে ঠিক জায়গায় আঘাত হেনেছে। ফাটিয়ে দিয়েছে। ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তরল আগুন। সমস্ত অক্সিজেন পুড়িয়ে দম বন্ধ ক'রে দেওয়া তাপ। বিষের ধোঁয়া। যন্ত্রণা। হাঃ। যাকে বলে নরক। মাই মাই। কি না পারি আমরা। আগেই বলেছি স্যর আমরা এটা পারি পারি পারি পা রিপা রিপা রি

উলু ওর কোমর জড়িয়ে ধ'রে ঝাঁকুনি দিল—এই

—আঃ। যন্তর-না

—হ্যাঁ যন্তরের মত ব'লে যাচ্ছ। চল, বিছানায় গিয়ে একটু শোবে

—না মিশাইল, এই লোক আমার বস্ না শত্রু বুঝতে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে। অনেক দিন

ঘুমাইনি। কিন্তু ঘুম আসার আগে আমাকে ব্রিফ করতে হবে। লুক্। এই দাগটা ফাটল। ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কাঁপা কাঁপা। জ্যান্ত মানুষ পুড়তে পুড়তে দাপাতে থাকলে ধোঁয়া ওরকম কাঁপে। এটাকে কত্থক নাচের শাদা ঘাঘরা বলা যেতে পারে। ঘুরন্ত। নিচে পোড়া দগদগে পাগুলি। কি দেখছেন মশাই, ঠ্যাঙ? ওটি হচ্ছে না। পুড়িয়ে দিয়েছি। এঃ থুঃ। গন্ধ। দম বন্ধ হয়ে আসছে। পালাও পালাও। উলু ওর হাত ধ'রে বলল—চাঁদু, শান্ত হও। এরকম করতে থাকলে আমি কেঁদে ফেলব। তুমি কি তাই চাও?

—কে কাঁদবে? কাঁদার জন্য কেউ আছে নাকি? তিনশ বাচ্চা তিনশ মা আর তিনশ ভগবান পুড়ে মরলে কে কার জন্য কাঁদবে? বুউম্। দেখছ ওরা কেমন অন্ধের মত বাইরে আসার রাস্তা খুঁজে দেয়াল আঁচড়াচ্ছে মাথা ঠুকছে। হেঃ চিচিং ফাঁক ভুলে যাওয়া লোকটার মত।

—কই? নাতো। কি আবার দেখব?

—দেখতে না পেলে তবে আর কিসের জন্য দুঃখ? কার জন্য দুঃখ? যা হয়েছে তা হয়েছে যাহেতাহেছেছে যাহেতাহেছেছে···

আমি এবার খুব ধমক দিলাম—এই চন্দ্রবদন। চন্দ্রবদন থেমে গেল। কি রকম ফ্যালফ্যাল ক'রে চারপাশে তাকাতে থাকল। অচেনা লোকের ভিড়ে একটা চেনা মুখ খুঁজলে ওরকম তাকায়। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল।

—কাকে ডাকলেন স্যর? চাঁদ ওঠার পর পেট্রিয়ট ছাড়লে ওই একটা মজা হয়। কোনটা চাঁদ আর কোনটা মিশাইল বোঝা যায় না। এই মিশাইল, তুমি কি চাঁদ?

উলু ভেজা ভেজা গলায় বলল—উঁ

আমি বুঝতে পারছি চন্দ্রবদন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে, ওর সঙ্গে বাস করলে উলুও পাগল হয়ে যাবে। আমার বাল্যবান্ধবী তা চাইলেও হতে দেওয়া চলে না। বললাম—যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে উলু. একটু আলোচনা আছে। ব্যালকনিতে চল।

চন্দ্রবদন এবার হ্যা হ্যা ক'রে হাসল - সাবধানে যাবেন স্যর, যে কোন সময় ক্র্যাক করবে। মানে, এই যে পয়েন্টটা এখানেই শিশু হসপিটালটা ছিল। এখন পাহাড় হয়ে গেছে। ওখানকার সমস্ত বাচ্চারা তার আগে এই যে এই পয়েন্টটা এর নিচে মাটির গর্ভে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন পুকুর হয়ে গেছে। রেহাই পেল না। একটু আগে আমাদের অদ্ভুত টেকনোলজি ওদের সাবাড় করে দিল। নিজেদের মুণ্ডু খুঁজতে ওদের চোদ্দ, ষোল, বিশ ফুট দূরে হেঁটে যেতে হবে। এই যে একজনের ফুসফুস একটা তোবড়ানো বিমের মাথায় লেপটে এখনো ধক্ ধক্ করছে।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে উলুকে বললাম—যা আশংকা করেছিলিস তাই হতে যাচ্ছে। তবে অত্যন্ত আধুনিক পাগল। বলা যেতে পারে হাইটেক্ পাগল। ইলেকট্রনিক পাগল। মূর্তিমান স্টারওয়র। এ অবস্থায় তোকে রেখে যেতে মন সরছে না। যদি বলিস তো সাহস যোগাবার জন্য থেকে যাই।

উলু ভয়ানক আপত্তি প্রকাশ করল—না না সে কিছুতেই হয় না পল্লল। রাতে এখানে অন্য লোক দেখলে ও আরো খেপে যাবে। তারচে' ক্যাম্পোজ এনে দে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখি। কাল ডাক্তার দেখাব। বাড়িতে কল দিস। চেম্বারে না। প্রচার হয়ে যাবে। ওকে লোকে পাগল বললে সহ্য করতে পারব না। যা কিছু বিটুইন ইউ এণ্ড মি। আর ডাক্তারকে তো জানাতেই হবে।

—ঠিক আছে এখানেই আনব। পাগলের ডাক্তার ভার্মা চেম্বারে বসার আগেই।

তাই হ'ল। ঠিক সাতটা তিন মিনিটে ডোর বেল বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রবদন নিজে দরজা খুলে ডাক্তারের হাতে হাত মেলাল। যেন কতকালের চেনা। টেবিলে ডাক্তার আর চন্দ্রবদন আমি আর উলু মুখোমুখি। ডাক্তার ভার্মা লবণদানিটা দুটো আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে চন্দ্রবদনের কথা শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে এক্স-রে চোখে দেখছিলেন।

—আজ প্রেস-কনফারেন্স ডাকা হয়েছে ঠিকমত খবর পেয়েছেন দেখছি।

ডাক্তার মুচকি হেসে বললেন—হুঁ

আসার আগে ডাক্তারকে সব খুলে বলেছি। কিন্তু এ কিরকম দেখা? তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি পাগলের ডাক্তারকে পাগল পছন্দ করে। যাকে বলে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া। চন্দ্রবদনের বদন এখন বেশ উজ্জ্বল।

—সমস্ত পৃথিবী একটু পরেই দেখবে কতদূর থেকে কত নির্ভুল ভাবে আমরা মেরে দিতে পারি। মাটির গর্ভের বাচ্চা-কাচ্চা সমস্তটা একটা পিণ্ড। চর্বি থেকে আবার নতুন তেলের খনি হবে। তারপর আবার যুদ্ধ। আরো নিখুঁত খুন। তখন চাঁদ থেকে পৃথিবীর একটা পিঁপড়ে টিপ ক'রে মেরে দিতে পারব। এখন মাত্র পাঁচশ মাইল দূর থেকে পারা যায়। দারুণ না!

--দারুণ। কিন্তু একটা লোককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রেসিডেন্ট বানাবার জন্য ওকে আমাদের দরকার। আপনি চন্দ্রবদন মিত্রকে চেনেন?

চন্দ্রবদন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল—কে?

—একজন লোক। লোক। বাঙ্গালি ভদ্রলোক চাকরি করে। কমপিউটার প্রোগ্রামার। বউ আছে। নাম উলু মিত্র।

—০ ০ ০

—ডাক্তার এবার চট ক'রে উঠে ফিরে চন্দ্রবদনের ঘাড়ের নিচে থাপ্পড় মারলেন—চেনেন না? উঠে দাঁড়ান কথা শুনুন। না হলে মাথায় ইলেকট্রিক শক দেব। উঠুন উঠুন। হুঁ। বসুন। হুঁ। আবার উঠুন। হুঁ। আবার বসুন। হুঁ। এখান থেকে হেঁটে জানালা পর্যন্ত যান। হুঁ। ফিরে আসুন। হুঁ

উলু করুণ গলায় বলল—ডাক্তার।

—আঃ মিসেস মিত্র। পেশেন্টকে ভাল ক'রেবুঝতে দিন। দরকার

মত একটু আধটু জোর করতে হয় আমাদের। কি চন্দ্রবদন মিত্রকে চেনেন? পাঁচশ মাইল দূর থেকে পিঁপড়ে মারতে পারেন আর নিজেকে চিনতে পারেন না?

—আঃ চিনব চিনব। এখন ভেবে দেখার সময় নেই। দেখছেন না পৃথিবীর সমস্ত চোখ আমার দিকে। এক্ষুণি প্রেস-কনফারেন্স।

চন্দ্রবদন উঠে গিয়ে টিভির বোতাম টিপে দিল। স্পেশাল ওয়ার বুলেটিন। গত রাতে বাগদাদে হিরোসিমায় ফেলা এটম বোমার সমপরিমাণ টি এন টি-র মারণাস্ত্র বর্ষণ। ভূগর্ভস্থ আশ্রয় শিবির বিধ্বস্ত।

ডাক্তার আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন—ক্লিয়ার। ওয়ার বুলেটিনে খুব উৎসাহ। যুদ্ধের ছবি দেখাটা বেশিরকম হয়ে গেছে। স্ট্রেন পড়েছে। আ কেস অব ফিকসেশন। সিজোফ্রেনিয়া। নিজেকে সেনাপতি টেনাপতি ভাবছে। এই ধরণের ম্যানিয়াক স্টেনম্যান হয়ে যেতে পারে। খুব সাবধান।

পর্দার সেই চাঁদের পিঠ ঘেঁষে চলে যাওয়া চাঁদের মত পেট্রিয়টের গোলা। মেঘ মেঘ ধোঁয়া। বিস্ফোরণে উৎক্ষিপ্ত শরীরের শূন্যে পাক খেতে থাকা। আমার মনে হ'ল নিরালম্ব মানুষ গৃহ হারাবার দুঃখে নিজেই গৃহ হতে চাইছে। মহাপ্রলয়ের শঙ্খধ্বনির মত সাইরেনের আওয়াজ। মাটির গর্ভে সারিবদ্ধ মানুষের উই সুলভ অবতরণ। উপরে অবিরাম ভাঙচুরের শব্দময় অন্ধকারে পথ ভুলানো আলেয়ার মত নীলচে হলুদ আলোর দপ্‌ দপ্‌। আশ্রয়স্থলে এক পড়ুয়া মেয়ের কোলের ওপর খোলা বই। পাশে জলের বোতল। ঘুমন্ত কুকুর। ফোকলা শিশুর নিষ্পাপ গোলগাল মুখের ক্লোজ-আপ। জীবনের অপরাহ্নে পাশাপাশি বসে থাকা প্রৌঢ় দম্পতি। এরাই টারগেট। চন্দ্রবদন দেয়ালে যে ক্রশ চিহ্ন এঁকেছে হুবহু তা পর্দায় ফুটে উঠল। ছেদ বিন্দুটা ওই মেয়ের ওই শিশুর ওই দম্পতির পৃথিবীর ভালবাসা, ভবিষ্যৎ এবং সুখ-দুঃখের ইতিবৃত্তের সঙ্গে চির বিচ্ছেদ বিন্দু। তিনশ বাহাত্তর মাইল দূরে

আততায়ী। কমাণ্ডার স্টেফান বলছেন—ধ্বংস প্রযুক্তিতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি···এবার আমরা তিনজনেই চমকে উঠলাম এবং চন্দ্রবদন ঘুমিয়ে পড়ল। উলু আর্তনাদ করে উঠল। ডাক্তারের হাতের ধাক্কায় লবণদানি উলটে গেল। চন্দ্রবদনের মুখ টিভির পর্দায় ফুটে উঠেছে। ওটাই কমাণ্ডার স্টেফানের মুখ। ভয়ানক ভয়ানক। হুবহু হুবহু এক। লাল চোখ। ছোট ছোট চুল। থুতনিতে লোম সহ আঁচিল। সেই গলার আওয়াজ। কথা বলতে বলতে তর্জনি তুলে ধরা। এমন কি বলার বিষয়টাও এক। উলু বুঝতে পারছে না কে ওর চাঁদু। ডাক্তার ধাঁধায় পড়েছেন কে ওঁর পেশেণ্ট এবং আমি ভাবছি কমাণ্ডার স্টেফান আর চন্দ্রবদনের এই যে একটা অসম যুদ্ধ··· □

সফিউল আলম

কবি নিরুপম এক সন্ধ্যা ও কয়েকটি মুখ

গাঁয়ের পূবদিকে একটা প্রাচীন বটগাছ। তিনদিক থেকে গোড়াটা শানমোড়া। গজ পাঁচেক দূরে বাঁধানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেবে গেছে পুকুরের গর্ভে। জল ছুঁই-ছুঁই পা দু'টো ঝুলিয়ে একান্তে খোলা আকাশটার সঙ্গে কথা বলছিল নিরুপম। আজ আকাশটা যেন তারায় তারায় ঘন হয়ে এসেছে। দূরে, পূবের দিকে কাজলাদহের সবুজ ধানের মাঠ অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে। পুকুরের জলে ভাসমান পদ্মের রঙীন রেশটুকু ঝাপসা ; তবু একটা কী রকম আস্বাদ যেন উঠে আসে আশ্বিনের এই সাঁঝবেলায়। দক্ষিণে কইমারী বিলের ওপারের গ্রাম গোবিন্দপুরে গুড়-গুড় ঢাকের শব্দে পুজো এলো বলে। উল্টোদিকে পশ্চিমে রাস্তাটা যেখানে তিনদিকে ভেঙেছে ;—নতুন বাজারে চায়ের দোকানে আলোচনার ঝড় বইছে। বাজারটা নতুন, আলোচনাটা সদ্য পুরনো। বন্‌ধ খোল আনাই সফল। উচ্চস্বরে তার বিরুদ্ধে গোলাবর্ষণ হচ্ছে,—'কোনো মতেই না, বন্‌ধ সর্বাত্মক বিফল।' নিরুপমের কানে এসে একটা মৃদু ধাক্কা দিল শব্দগুলো। একটুখানি মনোনিবেশ করতেই সে বুঝতে পারল দু'পক্ষের স্বরের অভিভাবক কারা। খানিকটা বিব্রত বোধ করল সে। নিরিবিলি আকাশের সাথে একটুখানি কথা বলবে তার জো নেই। সর্বত্রই শুধু বন্‌ধ আর বন্‌ধ—দেশটার যেন বন্‌ধের ব্যামো হয়ে গেল। গা-টা মুহূর্তের জন্য গুলিয়ে গেল নিরুপমের। উঠতে চাইছিল তখনই। কী যেন একটুখানি ভাবল। তারপর হাইড্রোজেন বেলুনের মত বেশ হালকা মনে হল নিজেকে। 'বাবা তোমার শরীর কি আগের থেকে একটু ভালো মনে হচ্ছে ?' বাবা এ পাশ ফিরে তাকাতেই

চোখাচোখি হল। তারপর একটা কী রকম না-বোঝা ইঙ্গিত দিয়ে ফিরল সঙ্গে সঙ্গে। বুকের ভেতরে ভালোবাসার শেকড়ে হঠাৎ টান পড়লো নিরুপমের। না। আমি সইতে পারব না। বেলুনটা চুপসে গেল হঠাৎ। ভারী পা দু'টোকে জোর করে তুলল সে। এক পা দু' পা করে শানমোড়াটায় বসল এসে। ডান দিকে মুখটা কাত করে দৃষ্টি ফেরালো একবার তার বাড়ির উদ্দেশ্যে। চোখটা বুজে এল। শুধু আঁধার। নক্ষত্রেরা কেবলই যেন মিছি মিছি রাত জেগে রয়। গাছের পাতাগুলো থেকে মৃদু নিশ্বাসের শব্দ পেল সে। গাছের তলে একা এই সন্ধেবেলা, গাছের মতো ভালোবাসা, পাতার আনন্দে আমি—তার এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে গাছাশ্রিত রোমান্টিকতা তাকে এই মুহূর্তে বিমর্ষই করে তুলল যেন। পাতা ঝরার শোকে নিজেকে জড়ানো বা এড়ানো বড় কথা নয়, আপাতত এই শরীর কিছু বাড়তি অক্সিজেন চায়। তাই গাছের রান্নাঘরের পরিত্যক্ত বিষবায়ু সেবন না করাই উত্তম। আবার উঠে সোজা হাঁটা দিল পশ্চিম মুখে, ধীর পায়ে শব্দহীন তরঙ্গে।

মনসার মন্দিরের দেয়াল ঘেঁষে দেবদারু গাছটা ঋজু হয়ে আঁধার ফুঁড়ে উঁকি মারছে। মন্দিরের উত্তর দিকে রাস্তাটা দু-ফাঁক হয়ে চলে গেছে বাঁশঝোপের ভিতর দিয়ে রত্না মণ্ডলের শ্যালো-ঘরের দিকে। নিরুপম চেয়ে দেখল সেদিকটায়। আজ বেশ অন্ধকার। ফাঁকা ফাঁকা। লোকজন নেই। বেস্পতিবার। ভেবার হাট থেকে হাড়িপাড়ার বৈদ্য, গনেশ, ভ্যাদা কেউই ফেরেনি। নইলে একটা অ্যালবেলে গন্ধ ছড়িয়ে যেতো, তুখোড় ভাষাগুলো প্রাণের স্বচ্ছলতায় ভেসে বেড়াতো বাতাসে। 'মাইরী বইছি দাদা, বউটা মোর পাগলী না হলে সাধে আর মুই গৌরীর হাত ধরে দু-মাস না-পাত্ত হয়ি।' 'ঐ গরম মশলা ছুঁড়িটা তোর হাতের সিঁদুর নেইছে, ধন্যি জীবন তোর রে শালা।' এই রকম অনেক কথা নিরুপমের স্মৃতি-যাদুঘরে জমা আছে। চায় শুধু মৃদু রোমন্থন। তারপর সব ছবি এক এক করে সোজা চলতে থাকে সিনেমা রীলের মত। সামনে কারা যেন হ্যাপা হ্যাপা করে এগিয়ে আসছে, ডুব অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে

না সঠিক। নাক বরাবর পৌঁছানোর সময় নিরুপম সঠিক উপলব্ধির জন্য থমকে দাঁড়াল।—'কে আছে?' —আমি নিরু। কে? ময়ন?—হা। কি ব্যাপার রে?—নিরু জিজ্ঞেস করে।—ডাইরীয়া। ফ্যাসাদ। —'কি জ্বালা দেখ কাকা; শালা এখুনতক হাট থ্যাকে আসার কাথা নাই। পাগলীটা মরবে বুঝি। হাসপাতাল পহুঁচায় দি, কী করি। তিনজনে দড়ি বাঁধা দোলনাটা কাঁধে পিঠে নিয়ে বড় হ্যাপা করে খরবা এস-এইচ-সি-র দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। নিরুর দাঁতগুলো তখন একটু সাপটে গেল দু'চোয়ালের পেশী শক্ত করে। যাবার পথে পাগলীর বাড়ি হয়ে একটু বাচ্চা দুটোকে দেখে যাবে ভাবল।

দুপুরে বৃষ্টি হয়ে গেছে দু'পশলা। বাতাসটা যেন কেমন ভারী ভারী মনে হচ্ছে। সীতারামের বেগুন জমির উত্তর পাড়ে দীঘিতে নেবে বোধ হয় একটা কুকুর চট্ চট্ জল খাচ্ছে। ওদেরও মনে হয় পিয়াস বেড়েছে এ সময়। টুঁয়া-টুঁয়া করে সদ্যোজাত শিশুর কান্নার শব্দ। কানটা সজাগ করলো নিরু। মনে হল উপেনের বাড়ি। আজই হল মনে হয়। সাতটা হওয়ার পর সেধে তাকে বলেছিল নিরু –'এবার আপারেশনটা অবশ্য অবশ্যই যেন হয়।'—'ভগমান দিলে করার কী ছে ভাই।' এবারও ভগবান হয়তো ছেলেই দিয়েছে। পঞ্চপাণ্ডব হল। উপেনের মহাভারত এবার শুদ্ধ হবে। ভারী শখ তার গেঁয়ো যাত্রাদল গড়ার। পালার নাম 'কুরু ক্ষেত্রের যুদ্ধ।'

একটু এগিয়েই সত্যেনের বাড়ির খুব কাছে থামল নিরু। ইট গাঁথা টালির ছাদের নতুন বাড়িটা এই সেদিনই খুব তাড়াতাড়ি গড়ে দিল নিরুরই এক কণ্ট্রাক্টর বন্ধু। ইন্দিরা আবাসন যোজনার ঘর। ছয় ভাগ আটভাগ না জানা সত্যেনকে কে যেন তাতিয়ে দিয়েছিল সেদিন। আঙুলের নামের সার্থকতা সেদিন সত্যেন দেখিয়ে ছেড়েছিল কণ্ট্রাক্টরকে। নিরুপায় নিরু মধ্যস্থতা করে দিয়েছিল ছয়ভাগ আটভাগ না জেনেই। শুধু বলেছিল—'ও আমার বন্ধুলোক, তুই আমার ঘরের লোক, তোর ঘর খাসা হোক্।'

—সত্যেন ? বাড়ি আছিস ?

—'হাট থ্যাকে আসে নি।' ওর বৌ উত্তর দিল ঘর থেকেই। এ সময়ে হাটে হাঁস খুব সস্তা। ওরা না নিয়ে আজ ফিরবে না। ফেরার পথে চণ্ডিপুরে ঢুকবে যোগেনের বাড়ি। মালপত্তর নিয়েই ফিরবে এই বেস্পতিবার রাতটা মাতাল করার জন্যে। ওদের দিন বারে যায় আসে না। রত্না মণ্ডলের শ্যালো ঘরে শূন্যতা বড় বেমানান। পুত্র-শোকে মাছের মা কখনো কেঁদে ফেললেও ভ্যাদা যাবে না হাসপাতালে খোঁজ নিতে। ওর ঘরে দু'দুটো নাদান ছেলে মেয়ে। গৌরীর কপালে কোন টিপটা বেশি মানাবে তাই নিয়ে হাটের দোচালা দোকানে বসে ভেবেছে অনেকক্ষণ হয়তো।

পায়ে পায়ে জড়তার শৈবাল ভেঙে এগোচ্ছিল নিরুপম। তার চোখে কিছু স্বপ্ন ছিল, তার কিছুটা হয়তো থিতিয়ে রয়েছে কোন নিগূঢ় নিভৃত অলিন্দে। একুশ বসন্তে তাপসীর শরীরে বেনোজলের ঢল নেমেছিল। বাঁধ ভেঙে নিরুপমের হৃদয় ছয়লাপ করে তুলেছিল। কিন্তু কোথায় সেই তাপসী। কেন সে আজ অন্ধকারে জলের শূন্য গেলাসটি ধরে মৃত্যুমুখে পতিত পিতার শিয়রে বসে আছে। এই রকম একটা ভাবনা হঠাৎই পেয়ে বসল নিরুকে। পদ্য লিখে আর কতদিন চলবে রে খোকা —মা-ও ঠিক এই সময়ে নিরুকে কিছু অস্পষ্টভাবে বলতে চায়। 'কিন্তু কি করবো মা, পদ্যকে যে আমি ভালোবেসে ফেলেছি ; ওকে যে ভুলতে পারবো না।' 'তাই বলে ঘর সংসার সব ত্যাগ দিবি।' থিতানো সমুদ্র সৈকতে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাওয়া এক পথিককে অনুসরণ করল সে, তারপর মহাসমুদ্রের অগাধ জলরাশির একটি ঢেউ এসে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল মুহূর্তে।

একটু এগিয়েই হরিশের বাড়ি, সংলগ্ন বাঁশঝোপের মধ্যে জোনাকিদের ইতস্তত ছোটাছুটি। ঝিঁ ঝিঁ-র ডাক। মায়াবী মাটির মন কেমন করা সোঁদা গন্ধ। হালকা পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে নিরুপম। মাথায় বোঝা হয়ে ভাবনাগুলো তার সঙ্গে সঙ্গে। ভাবনার বোঝা

নিয়েই সে হাঁটে, হাঁটতে ভালোবাসে। গা ছোঁয়া অন্ধকারে ভাবনার আলো ছড়াতে ভালো লাগে তার গনেশের বাড়ির পূব দিকের দেয়ালটা ধ্বসে গেছে গেল বর্ষায়। টিমটিমে আলো উঁকি মারছে। তারই কাছ ঘেঁষে বসে গণেশের পাঁচ বছরের ছেলে চিৎকারের সুরে পড়ে চলেছে -আগডুম বাগডুম ঘোড়ার দিম সাজে, ধাক মিরদং ... .। না, না, আগডুম না, আগডুম বাগডুম ....। শুধরে দেয় গণেশ। ছেলে আবার পড়ে। ভুল হয়। শুধরে দেয়। ছেলের জিভে 'ড' এখনো অস্ফুট। গণেশ সহজে হাল ছাড়ে না, ছাড়বে না। তার বড় ইচ্ছে ছেলেকে সে কমপক্ষে মেট্রিক পাশ করাবেই। নিজে সে প্রাইমারী ক্লাশ থ্রি পাশ। নিরুর ক্লাশমেট। বিশ বছর পিছনে ফিরে তাকাল নিরুপম। ময়লা প্যান্ট পরা গনেশ, পণ্ডিত এজারুদ্দিনের হুঁকা সেজে দিচ্ছে।

—'এই নিরু দিবি তু'টান! লে-লে ফট করে মারি দে।' নিরু বলে, না, দিমু না, উসব পারমু না পণ্ডিতকে কহে দিমু।' যেই না বলা,—তবে রে সাধু ছুধা। 'আঃ মরে গেনু গো বাবা গো' বলে চিৎকার করে উঠেছিল নিরু। চিমটায় জ্বলন্ত একখণ্ড আগুন তুলে বসিয়ে দিয়েছিল নিরুর ডান হাতের কব্জির কাছে। ফল যা হবার তাই। নিরুর ডান হাতে আজীবন পোড়া দাগ, গণেশের সারাটা শরীরে বেতের এলোপাথাড়ি ঘা এবং জীবনের জন্য স্কুল থেকে ছুটি। এই তো যেন গতকাল, এই রকম মনে হল নিরুপমের। বিশ বছরে নদীর জল সমুদ্র মোহানার কত কাছাকাছি এসে পৌঁছায় তার কোনো খেয়ালই সে করেনি। আজ এই আবছা অন্ধকারে কব্জির সেই দাগটা বাঁ হাতের আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বারবার পরখ করে দেখল নিরুপম। এক আশ্চর্য মলমের মত ভালোবাসার প্রলেপ পড়ল যেন তাতে।

—হেই ডাইন, হ্যাট হ্যাট। একটা গরুর গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ হাত দশেক দূরে। সম্বিত ফিরলো নিরুপমের। হাট থেকে ফিরছে মানুষজন রাতের অনিবার মোহে আপন বাসায়।

এতক্ষণে সে ভ্যাদার বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। গলির ভেতর দিয়ে ঢুকে, যেখানে পঞ্চায়েতের নলকূপটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে, এসে থামল নিরুপম। একটু ভাবল। বাড়ির ভেতরে গা ছম-ছম অন্ধকার।

—কে ? —আমি নিরু : পাঁচু দাদা নাকি ?

—'হ্যাঁ ভাই, মুই ছে। দ্যাখ না, পাগলীটাক হাসপাতাল ভর্তি করলে শুনমু. ডাইরীয়া হয়েছিলে ভেলে। ত ভাবমু ছুয়া ছুটার এট্টু দেখভাল দরকার, কি আর করি, হাট থ্যাকে আসেই ছুটেহে।' নিরু নীরবে সব শুনে বলল—তা একটু দেখাশুনা অবশ্যই দরকার। পাঁচু দাদা ততোক্ষণে উঠোন থেকে বারান্দায় উঠে ধুতির ট্যাঁক থেকে দেশলাই বের করে একটা পাট কাঠি জ্বালিয়ে দেখে নিল। হাটখোলা দরজা দিয়ে আলোর টুকরো ভ্যাদার দুই শিশুর উদোম বুকের উপর পড়ল। উঠোনের সোজা পুব দিক থেকে নিরুপমের চোখে এক আজব দৃশ্য খেলে গেল। হাড় জিরজিরে দুটি ঘুমন্ত শিশুর পাঁজর-গুলোর উপরে কতকগুলো মশা নেশাগ্রস্তের মত বসে আছে। পাঁচু দাদা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরেব কোণে গিয়ে টিবিন জ্বেলে দিল। আজন্ম খোঁড়া, প্রায় এক পায়ে হাঁটতে পারা বেপাড়ার পাঁচু দাদার ওই একটু খানি কর্তব্য স্বচক্ষে দেখার পর নিরুপমের মাথা লজ্জায়, শ্রদ্ধায় অনেকটা নিচু হয়ে এল। তারপর চুপি-চুপি এক পা দু' পা করে বেরিয়ে এল সেই গলির ভেতর দিয়ে। মন কেমন করা একটা অস্ফুট আর্তনাদ তখন তার হৃদয় প্রেক্ষিত জুড়ে। চোখে বিস্ময়ের একফালি জলছবি প্রেম, পৃথিবী, মা, মাটি, মানুষে মাখামাখি।

মাথাটার চুলগুলোর ভেতরে আঙুলের সবকটি ডগা ঢুকিয়ে নিরুপম ঘষতে-ঘষতে এক পা দু' পা করে গলির ভেতর থেকে রাস্তায় উঠে এল। মনটা নিবদ্ধ ছিল ভ্যাদার ঘুমন্ত বাচ্চাদের শরীরের উপর। সে হাঁটছিল উদ্‌ভ্রান্তের মত। আঙুলগুলো কখন যেন অবাধ্যের মত চুলের গোড়াগুলো খামচে ধরে উপড়ে ফেলার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। হঠাৎ

'সংরক্ষণ' কথাটা তীরের মতো তার কানে এসে বিঁধলো। বন্ধ সর্বাত্মক বিফল না সফল --সেই লড়াইয়ে -গাল ভরা বুলি আওড়ানোর চাপান-উতোর প্রতিযোগিতার এক মহারথী 'সংরক্ষণ' নামক ক্ষেপণাস্ত্রটা এমন হু-হুঙ্কারে চাউর করলেন তাতে নিরুপমের কর্ণপটহ বিদীর্ণ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু টালমাটাল দেহে নিরুপম বহু কষ্টে মুহূর্তের জন্য নিজেকে স্থির করে ফেলল। চোখ দিয়ে আগুনের গোলার মত দৃষ্টিগুলো ছুটোছুটি করছে যেন, এই গোলার সামনে মুখোমুখি হওয়ার শক্তি হারু মণ্ডলের বুকে নেই। অগত্যা এযাত্রা নিজেকেই ঠোঁটে কামড় বসাতে হল নিরুপমকে এক পাটি ধারালো দাঁত দিয়ে। তারপর একটা মস্ত বড় দীর্ঘশ্বাস—বুকের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের চাঙড় ক্রমশঃ মুড়ি হয়ে এল। অন্ধকারে এতক্ষণ একটা স্ট্যাচু হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল নিরুপম। বাজারের উল্টোদিকে রাস্তার নিচে হেড মাস্টারের সদ্য মরিচ লাগানো জমিটাতে হাজার ঝিঁ-ঝিঁ একসঙ্গে গাইছে, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে তাদের আকুল স্ফূর্তি। মুখ তোলে নিরুপম। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একসঙ্গে কয়েকটি মুখ, কালো ধোঁয়ার চাদরে ঢাকা। পরক্ষণেই চোখ গিয়ে পড়ে কাস্তেটার দিকে—শারদীয় উৎসবের তৃতীয়ার চাঁদ ; তখনো গাঁয়ের পশ্চিম পারে ছাদহীন প্রাইমারী স্কুলটার ক্ষয়ে যাওয়া বাঁশের ফ্রেমে আটকে আছে। সামনের রাস্তাটা বাঁক নিয়ে তার ঘরের দিকে মুখ করেছে। □

পূর্ণেন্দু ঘোষ

শহীদের মা

শেষপর্যন্ত কেটে দিল সলিল।

আগাপাশতলা নয়। শেষ অংশটুকু মাত্র। নিউজ-এডিটরের মতে,—'ভীষণ রি-অ্যাক্শনারি ক'রে ফেলেছেন আপনি।' লেখার অন্যান্য দিকটা সামান্য এডিট ক'রে নিলেই নাকি চালিয়ে দেওয়া যাবে। ....বেশি ত নয়। মাত্র দশ-পনের পঙক্তি। তাই কেটে দিল। সলিলের লেখবার মত কোন টেবিল নেই। মেটে নরম দাওয়ায় খেঁজুর পাতার চাটাইয়ে প্রায় সরীসৃপের ভঙ্গিমায় এখন সে। সুন্দর পরশুরামীয় হস্তাক্ষরের নিচে সম্ভবত আটাত্তর-উনআশির 'কম্পিটিশন মাস্টার'। একদা সরকারী পোষ্যপুত্র হওয়ার জরুরি অভিলাষ ছিল—সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। হতে পারে সময় এখন দশটার কিঞ্চিৎ অতিরিক্তই। তা'বলে এত তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনের চিড় ধরা কাঁচে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের আভাস ঘনিয়ে আসতে হবে! 'ও মা ....!' —মাকে ডাকল সলিল। না মুছলেই নয়। অক্ষর চেনা যাচ্ছে না। সুরবালা হ্যারিকেন মুছে দিয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। ঘরের মেঝেয় ঢালাওভাবে বিছানো কাঁথা। তার উপর পুরাতন টুকরো-টাকরা কাপড়ের ডাঁই....খালি শিশিতে রাখা সূঁচ ....পাড় থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া রঙচঙে সুতো। মায়ের সেই একই ধারার পূর্ববঙ্গীয় সূচীশিল্পের অভ্যাস। আগামী শীতের আয়োজন চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আজ রাতের মধ্যে সলিলকে তার আয়োজনটা সেরে ফেলতেই হবে। আগামী পরশুদিনের সাপ্লিমেণ্টে ঢুকে যাবে সামান্য এই ফুলস্কেপ ছ'পাতার নিউজ-ফিচারটা। নিউজ-এডিটর পার্থসারথী বসু সেইরকমই বলছিলেন। এই মুহূর্তে

সংযোজন নিয়ে নতুন ক'রে ভাবতে হবে। বেশি ত নয়। মাত্র দশ-পনের পঙক্তি। কেটে দেওয়া অংশে লেখা ছিল,—'···আমি ত শহীদের মা। ৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে কত ছেলে শহীদ হয়েছে। ৬৬ সালে পুলিশের গুলিতে চলে গিয়েছিলো আনন্দ-নূরুল ; আর এবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আন্দোলনে গেলো আমার ছেলে মাধাই। আমার এক মাধাই গেছে, হাজার মাধাই আছে........।' এরপর সামান্য প্রত্যয়দৃপ্ত বর্ণনা। শহীদ বেদীর সামনে মুষ্ঠি উত্তোলন ক'রে আছেন গয়েশ্বরী—শহীদের মা। বামপন্থী রাজনীতির পরিভাষায় যাকে বলে 'রেড স্যালুট'—লাল সেলাম। পার্থসারথী বাবুর এটাতেই আপত্তি। বড় কাগজের এই হল ফ্যাচাং। নিউজ-এডিটরের খুঁতখুঁতে ব্যায়রাম। হাইপোকনড্রিয়া। আজ নিয়ে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দিলেন। তবে কি সলিল বিশ্বাসের হাতে গদ্য ভাল খেলে না? চোখা চোখা শব্দচয়নে ভুল থেকে যায়! আদপে ব্যাপারটা ত সেরকম নয়। সেরকম হলে বলবার কিছুই ছিল না তার। সলিলের কফি-হাউসীয় বন্ধুরা জানে, তার গদ্য ভারি মসৃণ। কোথাও হোঁচট খেতে হয় না। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। যে কোন খটখটে বিষয় নিয়ে বসলে কলমের ক্যাপ কামড়ে জড়-ভরত সেজে বসে থাকতে হয় না তাকে। এক কাপ দুধ ছাড়া লিকার কিংবা নিদেনপক্ষে দুটো ইণ্ডিয়ান থাঁকি পেলেই সে যে কোন 'শুষ্কং কাষ্ঠং' মার্কা গদ্যে তার অনায়াস সাধিত কাব্যের সুসমঞ্জস ব্যবহার ঢেলে সেটাকে রসের সায়র করে তুলতে পারে। সলিলও জানে, এটা তার প্লাস পয়েণ্ট।

অথচ······

দু-দুবার পার্থসারথী বাবু ফিরিয়ে দিলেন লেখাটা। বিশেষত আজকের দৃশ্যটার মুখোমুখি হয়ে সলিল কি কিছু বোঝেনি? কাগজের দৃষ্টিভঙ্গী কী? নিরপেক্ষতার নামে কী ওরা এক্সপোজ করতে চান? ভান—ভান—সেণ্ট পারসেণ্ট ভান! বিড়াল তপস্বী!

'······নো, নেভার, এরকম করবেন না ভাই।' যেন দুলাল চন্দ্র

ভড়ের তাল মিছরি চিবিয়ে চিবিয়ে ভদ্রলোক বলেছিলেন। চোখ বুজেও শুনতে পাচ্ছে সলিল। এককালের তুঁদে সাংবাদিক মশায়ের ইঙ্গবঙ্গীয় বাণীটা এখনও নন্-স্টপ মিউজিকের মত অনবরত কানের কাছে বেজেই যাচ্ছে। বেজেই যাচ্ছে। কলমটা থামিয়ে রেখে এখন আর একবার ভদ্রলোকের 'ভাই' শব্দটায় আণ্ডারলাইন করল সে। ভাই! তা বেশ! তা বেশ! তা লিটল ম্যাগাজিনের দাদারে···তোরা কী চাস একটু খুলেই বল ত শুনি! ইয়েলো-রিপোর্টিং? ইয়েলো হলেই চলবে ত নাকি অন্যরকম পোঁ ধরবি আবার? কথাগুলো একান্তে সাজিয়ে ফেলায় রিফ্লেক্স অ্যাক্শনে জিভে কামড় খেল সলিল। ক্রোধের ভাষা কি এত অশ্লীল-অভব্য আকার নেয়! কিংবা ক্রোধ কি এরকম নাকি....'খাদ্য দেখেই কুকুরের লালা ঝরার' মত পাভ্‌লভীয় সূত্র! এর নিশ্চয়ই বিকাশ আছে। হুট বললেই হয় না। বস্তুত সলিলের কোন ক্রোধ নেই। সত্যি নেই। থাকলে বাইফোকালের সামনে জুজু হয়ে ছিল কেন? টেবিলে কাঁচের গোল্লা নিয়ে খেলতে খেলতে পার্থসারথী বাবু যখন বলছিলেন,—শেষপর্যন্ত তেলেঙ্গানার ইস্তাহার লিখে ফেললেন! আপনাদের নিয়েই যত মুশকিল! অ্যান্টি-এস্টাব্লিশমেণ্ট, লিটল ম্যাগাজিন, সুবিমল মিশ্র....ইয়ে....এটসেট্রা আপনাদের ব্রেনকে একেবারে ঢালাই করে ছেড়েছে দেখছি। যাচ্ছেতাই! পুরাতন রাগকেই আঁকড়ে ধরে আছেন।....তাই না?' তারপর সেই বাণী। '....নো, নেভার....ভাই।' না, সলিল কিছুই বলেনি। ঠায় চুপচাপ ব'সে থেকে নির্বিবাদে শুধু চেটে যাচ্ছিল বার্তা-সম্পাদকের জামার তলায় লুক্কায়িত তুষ্টু মডেলের ভুঁড়ি, অফিসিয়াল রুম, ভোস্তকের ক্যালেণ্ডার আর শুনতে পাচ্ছিল টেকনিক্যাল ডিপার্ট-মেণ্টের ওপাশ থেকে 'আমাকে দেখুন' টাইপের বিদেশী অফসেট মেশিনের গর্বিত আওয়াজ সহ আরও কিছু টুকটাক যন্ত্রের খুটখাট শব্দ। অপ্রাসঙ্গিক হলেও সলিলের গান গাইতে ইচ্ছে করছিল তখন। গান.... 'অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হলো কারাগার।'

এই মুহূর্তে সব কথা ভাবতে গিয়ে এক ধরণের আঠালো অবসাদ আর ক্লান্তি চতুর্দিক থেকে জুড়ে আসছে শরীরে। এই প্রথম অদ্ভুত বিপর্যয় তার। কিছুই আসছে না কলমের ডগায়। কিছুই আসছেনা। বেশি ত নয়। মাত্র দশ-পনের পঙক্তি। তোমাকে নিয়ে কী আমি লিখব শহীদের মা! তোমার মধ্যে ভেঙে পড়ার প্রতিচ্ছবি দেখিনি আমি। ক্ষয় দেখিনি। হতাশা দেখিনি। অথচ……।… …আমাকে তুই ক্ষমা কর সমীরণ! এভাবে লেখালেখির জগতে টিঁকে থাকা যায় না! এটা জীবনের পরাভব। বিশ্বাস কর।

সলিল একদিক থেকে সমীরণের কাছে কৃতজ্ঞই। কারণ তাকে নিয়ে সমীরণের চেষ্টায় আলস্য নেই। বড়লোকের লালু ছেলে না হলেও এমনিতেই তার বাড়ির অবস্থা ভাল। সখের বশে একটু আধটু লেখে-টেখে। 'হার্পুন' ছাপতে গিয়ে প্রেসের দেনা ছিল কয়েকশ' টাকা। সমীরণ সেটা নিজে থেকে হাত বাড়িয়ে শোধ করে দিয়েছে। —'এভাবে কতদিন পত্রিকা চালাবি সলিল? বিকল্প একটা কিছু ভাব। বিজ্ঞাপনের কাটিংটা দিয়েছিলাম, সেটাও হারিয়ে ফেলেছিস। বি-ক্লাসি ছাড়া কোন শালা দাঁড়িয়েছে বলতে পারবি? চোখের সামনেই দেখছিস না! যাদের তুই এতদিন ধরে বিশ্বাস ক'রে আসছিস। আমিও করতাম। সবাই করতো। তারাই এখন ছ্যাখ, ইলেকশন-বিশ্বশান্তি-ম্যাণ্ডেলার ফেস্টুনে জড়িয়ে গেছে ক্যামন! সব শালা বোগাস! সব শালা!' সমীরণের বক্তব্য একজন ব্যক্তিকে ডিঙিয়ে গোটা দেশের টোটাল পরিস্থিতিকে ছুঁতে চায়।

সলিল বলেছিল,—ওভাবে হয় না। হয় না........

—কিভাবে হয়? বল। পেটে খিদে নিয়ে বিপ্লব করবি। ওসব ট্যাবু মন থেকে ঝেড়ে ফ্যাল—বেঁচে যাবি। আমি বলছি, ফ্রিল্যান্সার চাইছে যখন, কাগজটায় ঢুকে যা। সংসারে দু' পয়সা দিতে পারবি। বড় কাগজের স্ট্যাম্পটাও……

একগুঁয়ে স্বভাবী সমীরণ কোন ওজর-আপত্তি শোনে নি।

শেষপর্যন্ত পার্থসারথী বসুর সঙ্গে সলিলের মিট্ করিয়েই ছাড়ল সে। সমীরণের সামনে কথোপকথনের সংলাপ চলছিল এইরকম।

—...... ......।

—ও......কবিতার বইও আছে! তাই নাকি!

—........ ...।

—ও........আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে। ভালই।

—.. ....।

—যাই হোক, বারো পার্টির মুভমেণ্ট সম্পর্কে কিছু জানেন? গত বছরের কথা বলছি........।

—জানি।

—একত্রিশে আগষ্ট........সম্ভবত একজন কিশোর শহীদ...... তারপর বাংলা বনধ্।

—ইয়েস। আপনার কাজ হবে শহীদের মা'র একটা ইণ্টারভিউ নেওয়া। ইনভেস্টিগেশনের টাচ্ দেবেন। মহিলাকে নাকি পার্টি ততটা পাত্তা দিচ্ছে না এখন। নেসেসিটি ফুরিয়ে গেলে যা হয় আর কি........। শুনছি ওখানে অ্যান্টি-পার্টি লু বইছে। আমরা কিন্তু এই ডেকাডেন্সকেই তুলে ধরবো। সাজিয়ে গুছিয়ে ফিচারের মতো ক'রে লিখবেন। পারবেন ত? ভেবে দেখুন........।

সম্মতি জানিয়ে সলিলকে অ্যাসাইনমেণ্টটা নিতেই হয়েছিল। যেহেতু সমীরণ......। কমলি নেহি ছোড়তা........।

না কোনপ্রকার গাফিলতী দেখায়নি সলিল। শহীদের মা'র অন্বেষণে তাকে যেতে হয়েছিল মথুরাপুর—ট্রেনপথে। সেখান থেকে বাসে চেপে আর একটু ভিতরে। অত ডাউন এলাকা থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা উতরে গিয়েছিল সেদিন। তবে তৃপ্তি ছিল কাজে। বড় পত্রিকার পরিচয় অন্তে গ্রামের দেওয়া আকণ্ঠ আতিথেয়তা—তা ভোলার নয় রে সমীরণ। ফ্রেসকপিতে অনুপুঙ্খ সবকিছু তুলে ধরেছিল সে। কিছুই বাদ রাখেনি। এমনকি সংযমী

শব্দের বুনটে গ্রাম্য পারিপার্শ্বিকতা, প্রেসিডেন্সীর সেই লড়াকু বেকার ছেলেটি, পেনসন না পাওয়া তেভাগার বৃদ্ধ সৈনিক·· সকলকেই সে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে ছ'পাতার ফিচারে। আর রচনার কেন্দ্রে ছিলেন শহীদের মা। আশ্চর্য! তার ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় সলিল ত কোন ডেকাডেন্স খুঁজে পায়নি! লিটল ম্যাগাজিন······লিটল পার্টি ·····ছোট দল··· · ছোট দলের ডেকাডেন্স! হে মহাত্মণ আপনারা কী চান? ইয়েলো রিপোর্টিং? শহীদের মা'র বিষাদগ্রস্ত প্রতিমা? এ ধরণের অদ্ভুত সাবজেক্ট তুলে ধ'রে আপনারা কী বোঝাতে চান? এদেশে কিছু হয় না? বৃথা, সমস্ত স্যাক্রিফাইস বৃথা? জটিলতম প্রশ্নগুলো মাথার মধ্যে ঘোঁট পাকিয়ে তুলছে। কাগজের ফাঁকা স্পেসে তথাপি সলিল খসখস ক'রে লিখে ফেলল। আলু-মূলোর মত বিকিয়ে যাচ্ছে কলমের সঙ্গীন। যাচ্ছে যাক। কিন্তু পরক্ষণে কী ভেবে লাইনগুলো কেটে দিল। আবার লিখল। কাটল · ।

দোদুল্যমানতায় ছটফট করতে করতে ঘরের ভিতরে তাকাল সলিল। দেয়ালে হেলান দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন মা। এসময় ঘুমিয়ে থাকা যায় না মা! প্রখর শীতের জন্য তৈরি হও! একপাশে খাটের বিছানায় শুয়ে আছেন সলিলের শ্রীযুক্ত পিতা, যেন শিল্পী শ্যামল দত্ত রায়ের 'ব্রোকেন-বাওয়েল'....জেলা স্কুলের রূপোর মেডেল পাওয়া ফার্স্ট বয় রাজশাহীর পঞ্চাশোর্ধ অনুকূল বিশ্বাস। ইণ্ডিয়ার প্রাইমারীতে পিতলের ঘণ্টা পিটিয়ে যিনি রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করতে চলেছেন। মাথাটা ছাড়িয়ে নিতে উন্মুক্ত নিশি প্রান্তরে বেরিয়ে আসল সে। উপরের আজব রহস্যময় অন্ধকারের গায়ে বসন্তের দাগের মত ফুটে আছে অসংখ্য তারকারাজি···নীহারিকাপুঞ্জ···আলফা সেণ্টাউরি··· নেবুলা···এ্যাণ্ড্রোমিডা। সবাইকে দেখা যাচ্ছে না অবশ্য। এ সময় হ্যালির ধূমকেতু দেখতে চাইল সলিল। সত্যি কি দেখা যায় না! ও.... এখন ত নাইনটি ওয়ান সবে। তার মানে এখনও তিয়াত্তর বছর পর।....হ্যালি।

—খোকা....আ....আ....আ।

কে যেন ডাকল ভিতর থেকে। সুরবালা নাকি গয়েশ্বরী! শহীদের মা! আবারও কি গয়েশ্বরীর কণ্ঠ....!

—খোকা ভাত খাবি আয়।

—যাই মা, আগে রাণী রাসমণি রোডের মিছিল থেকে আসি মা........।

ধীর পায়ে হেঁটে এসে লিখতে বসল সলিল। পুনর্বার ঝরঝরে হস্তাক্ষরে বার্তা-সম্পাদকের আপত্তিকর অংশটাই শেষপর্যন্ত লিখে ফেলল। সেই একই বর্ণনা। হুবহু। শহীদের মা'র কণ্ঠ থেকে এখন বীরভোগ্যা-বসুন্ধরার উৎফুল্লিত স্বর বেরিয়ে আসছে। '....হাজার মাথাই আছে।' তারপর....তারপর....বাইরের ইথার তরঙ্গের ভেলায় চড়ে ভেসে গেল সলিলের নিরুচ্চার কয়েকটি শব্দ।....প্রত্যয়ের রক্ত-রঞ্জিত মুঠো থেকে আমি অবক্ষয় ঝরাতে পারি না রে। পারিস ত সমীরণ ক্ষমা করিস। □

অভিজিৎ দত্ত

হনন-আত্মহনন

একসময় না একসময় সমাজবিরোধীদের সাথে রবির নিশ্চয়ই যোগাযোগ ছিল। যদিও এই বছর পাঁচেকে পাড়ার লোক সেরকম কিছু দেখেনি। পাশাপাশি থাকলেও একজন মানুষ অন্যজনের জীবন কতটুকুই বা জানতে পারে। আর, পাঁচটা বছর তো জীবনের একটা ভগ্নাংশ মাত্র। রবিকে জানার মধ্যে এইটুকুই যে, যতক্ষণ সে বাড়ি থাকত, বাজে কাজ, মোদ্দা কথায় অহিতকর তেমন কোন কাজকর্ম করতে তাকে দেখা যায়নি।

রাত গভীর; কটা হবে? দেড়টা, দুটো, বোমার আওয়াজে ঘুমে কাদা পাড়া জেগে উঠল। আচমকা ঘুম ভাঙা লোকজন জানালা খুলে, কেউ কেউ দরজাও খুলে ফেলেছিল, দেখল রবিকে এলোপাথাড়ি ঘুঁষি, লাথি মারতে মারতে বাড়ি থেকে টেনে বার করে আনা হচ্ছে। মাটিতে পড়ে গেছিল রবি। গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে। পরনের লুঙ্গিটারও প্রায় খুলে যাবার মত অবস্থা। মরা কুকুরকে যেভাবে নিয়ে যাওয়া হয়— সেভাবে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাকে গলি দিয়ে। রবির বাড়ি থেকে বাধা দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। চেঁচামেচি তো দূরে থাক। বাড়িতে লোক বলতে তো রবির বিধবা মা। তা মাও বাড়িতে নেই। কাটোয়া না কোথায় কোন আত্মীয় বাড়িতে গ্যাছে। গলির মুখে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল জিপটা। রবিকে টানতে টানতে ছেলেগুলো সেইদিকেই যাচ্ছিল। যাবার সময় বেপরোয়াভাবে ওরা বোমা ছুঁড়তে লাগল পাড়ার বাড়িগুলোর দিকে। পাইপগান থেকেও গুলি ছুঁড়ল। গলির ল্যাম্পপোস্টের টিমটিমে আলোতেও

দেখা যাচ্ছিল ওদের হাতের চপারগুলো। দরজা আগেই বন্ধ হয়ে গেছিল। পাইপগানের গুলি আর বোমার স্প্রিন্টারের ভয়ে গোটা শরীর দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে জানালার সামান্য ফাঁক দিয়ে সবাই দেখল রবিকে কিভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া হল। টেনে তোলা হল জীপে। কতকগুলো বোকা কুকুর শুধু জীপ চলতে শুরু করার পরেও ঘেউ ঘেউ করে পিছু নিয়েছিল। ছুটেও গেছিল কয়েক পা-- যেন বলতে চাইছিল এ অন্যায়। এ অন্যায়।

মানুষ কুকুরের চেয়ে বুদ্ধিমান। বিচার বিবেচনাও বেশি। কেউ বেরোলো না। শিষ্টতা, ভদ্রতা, সোজা কথায় ভালো মানুষ সেজে থাকা রবির ক্যামোফ্লেজ। গুণ্ডাদের সাথে রবির যোগসাজস আছে। অথবা এমনও হতে পারে একসময় ছিল। পরে হয়ত সেই (ভিসিয়াস সার্কেল) গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। খবর ফাঁস হবার ভয়ে রবিকে তুলে নিয়ে গেল। আগামীকাল, হয়তো বা আরো কয়েকদিন পর, অঞ্চলের ধারে কাছে কিংবা বহুদূরে নির্জন হাইওয়ের পাশে, রেললাইনের পাশেও হতে পারে রবির লাশ পড়ে থাকতে দেখা যাবে। শ্বাসনালী কাটা। মুখের ওপর ভন্‌ভন্‌ করছে মাছি। একঝাঁক কাক তারস্বরে চিল্লাচ্ছে—ভালো ভোজ হবে, দূরত্ব বজায় রেখে দুচারটে ভীতু অথচ লোভী কুকুর জিভ চাটছে। মানুষের কাছে বোঝা হয়ে থাকা একটা গরুর লাশ যেন পড়ে আছে। কারুর কিছু যায় আসে না।

আবার না মরে রবি যদি ফিরেও আসে তাহলেও সবাইকে সাবধান হয়ে যেতে হবে। ওকে এড়িয়ে চলতে হবে। কথা যত কম বলা যায় তত ভাল। আগের মত—ও রবি চা খেয়ে যা, বলে বাড়িতে ডেকে আনা উচিত হবে না। বাড়ির ছেলেমেয়েদেরও বলে দেওয়া দরকার ওর সাথে যেন না মেশে।

রাস্তার মোড়ের ল্যাম্পপোস্টে টিম্‌টিমে বাল্বটা জ্বললেও জীপের নম্বর পড়ার মত আলো ছিল না। তবু যদি কেউ জীপের নম্বরটা দেখে থাকে, তাহলে চেপে যাওয়া ভালো। রবিকে যারা তুলে নিয়ে গেল তারা গুণ্ডা —সমাজবিরোধী—ওরা সঙ্ঘবদ্ধ। প্রতিশোধ নিতে সবসময় তৎপর।

অধিকাংশ মানুষই শান্তিপ্রিয়। পাশাপাশি থাকলেও ছাড়া ছাড়া। প্রত্যেকেরই আলাদা নিজস্ব জীবন আছে। কে চায় অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনতে ? শান্ত জীবনের আড়ালে ছড়িয়ে আছে ব্যাপক সন্ত্রাস।

গভীর রাতে পাঁচ বছর ধরে চেনাজানা রবি অপহরণের পর অন্য রবি হয়ে গেল। সামাজিক ন্যায় নীতি লঙ্ঘন করা কলঙ্কময় একটি বিচ্ছিন্ন চরিত্র। যদিও তার আসল অপরাধ যে কি সে সম্বন্ধে কারুর কিছু জানা নেই। তবু কার্য-কারণের চিরন্তন সম্পর্কের নিয়মে রবি অপরাধী। একবুক ভয় নিয়ে যে যার জানালা বন্ধ করে দিল। কুকুরগুলো অবশ্য চিল্লিয়ে যাচ্ছিল—এ কেমন অনাচার, বলা নেই কওয়া নেই বোমাবাজি করে একটা লোককে তুলে নিয়ে যাবে ?

শুধু শুনে যাওয়া ছাড়া বলার কিছু ছিল না রবির। কিছু বলতে গেলে ঠোঁট আর জিভের সামান্য কিছু কম্পন দরকার। সেটা করা যাচ্ছিল না। মুখের ভেতর কাপড় গোঁজা। বাইরে থেকে মুখ বাঁধা। চোখও। হাতের কব্জিতে আর পায়ের পাতার কিছু ওপরে নারকেল দড়ি নুনছাল ছিঁড়ে মাংসে বসে গেছে। জীপের পিছনের খুপরীতে দু সীটের মাঝে পড়ে আছে তার দুমড়ানো মুচড়ানো শরীর।

গায়ের ওপর কয়েক জোড়া জুতোর চাপ আর গাড়ির অবিশ্রান্ত ঝাঁকুনি। শরীর ঘামে ভিজে জবজবে। স্নায়ুগুলো স্থবির নিশ্চল পাথর হয়ে যাচ্ছে যেন। হাত-পায়ে যেন নুনছাল ওঠার যন্ত্রণাবোধও নেই। আছে শুধু ভয়। একরাশ মৃত্যুভয়। রাস্তার স্পীড ব্রেকারের জন্য গাড়ির গতি কমলেই গা শিউরে উঠছিল। এই, এইবার বুঝি গাড়ি থামল। তারপর, তারপর.......। ছেঁড়া গেঞ্জীর বাইরে উন্মুক্ত পিঠের ওপর মাঝে মাঝে পড়ছে আগুনের টুকরো। আধপোড়া বিড়ি বা সিগারেটের। মাংস পুড়ে ঢুকে যাচ্ছে আগুন। থরথর করে কেঁপে ওঠে শরীর। ন্যাকড়া গোঁজা মুখ থেকে ছিটকে আসে গোঙানি। মারবে। একটু একটু

করে। যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে। চোখ বাঁধা থাকলেও বুঝতে পারছিল প্রতিহিংসার চাউনি নিয়ে পাঁচটা চোখ দেখছে ওর শরীরটা।

রবি চিৎকার করেছিল—বাঁচাও, বাঁচাও—কালীদা, মেসোমশাই, বেবী বৌদি, পিসীমা, সিংজী। একবার নয় বার বার। আকুলভাবে। আশপাশের লোকগুলোকে এত আপন মনে হয়নি কখনো। ওর চিৎকার শুনেই গাড়ি স্টার্ট দেবার হ্যাণ্ডেল নিয়ে বেরিয়ে আসবে জি. টি. রোডে ফুল পাঞ্জাব লরী উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া কালীচরণ মৃধা, গ্যারেজের ঝাঁপ খুলে এগিয়ে আসছে বুড়ো সর্দারজী, বঁটি হাতে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বিধবা রাণী পিসীমা।

শক্ত করে চোখ বাঁধা কাপড়ের টুকরোটা জলে ভিজে যাচ্ছিল। কেউ আসেনি। কুকুরগুলো ছাড়া। চেনাজানা গণ্ডীর মধ্যে থাকতে থাকতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছিল—নিজের এই একক বিপন্ন অস্তিত্ব—ভাবতে পারছিল না সে। গায়ে আবার ছ্যাঁকা দিয়ে গেল আগুনের টুকরো। মুচড়ে উঠল শরীরটা। কয়েকটা লাথি পড়ল। গলার কাছে চেপে বসল ভারী পা। এই মুহূর্তে যদি শ্বাসনালীতে....চপারের একটা সামান্য চাপ বই তো কিছুই নয়। গলার কাছটা শিরশির করে উঠল।

একটা কাক মরলে হাজারটা কাক চিৎকার করে। আক্রমণকারীকে ঠোক্‌রায়। অথচ একগাদা লোকের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও মানুষের নিরাপত্তার কোন দাম নেই! বিশাল সমুদ্রে মানুষগুলো যেন এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। সজীবতার খোলসবন্দী হয়ে বসে আছে নিজস্ব ঘেরাটোপের মাঝে। মুখ, হাত, পা বাঁধা সে পড়ে আছে পাঁচটা খুনের পায়ের তলায়। নিজেকে সামাজিক জীব ভাবতেই ঘেন্না লাগছিল তার।

মৃত্যুর চেয়ে মৃত্যুভয় অনেক ভয়ংকর। চপার দিয়ে গলায় একটা কোপ বসিয়ে দিলেই কাজ মিটে যেত। থাকত না মৃত্যুভয়। সহজ মৃত্যু পেয়ে বেঁচে যেত রবি।

ওর চোখের বাঁধন টান মেরে খুলে দেওয়া হল। ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল সে। সামনে ধূসর পৃথিবী। সত্যিই ধূসর। চোখ খুলে দেবার আগে গাড়ি থেকে টেনে নামানো হয়েছে তাকে। যেমন ভাবে তোলা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে। ঘুষিতে চোখের ওপরটা ফুলে উঠেছে। ঠোঁট কেটে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

গাছ-গাছালির মাথায় থিতিয়ে আছে ফ্যাকাশে জ্যোৎস্না। আবছা নীল আকাশে ধুক্‌পুক্ করছে একটা, একটা মাত্র তারা। পায়ের নিচে অসমতল ভূপৃষ্ঠ। সামনে ওটা কি? রেললাইন? হবে হয়তো। ঘাড়ের ওপর পড়ে গরম নিঃশ্বাস। রবি তাকালো। আঁধারের কালি লেপা কতগুলো মুখ। বুকে জমে থাকা কথাটা থম্‌কে থম্‌কে বেরিয়ে এল। নিজেই চিনতে পারে না নিজের গলা—আমাকে ধরে এনেছেন কেন? কি করেছি আমি? কালো একটা হাত এগিয়ে এল। থ্যাব্‌ড়া আঙুল-গুলো চেপে বসল তার গলায়—শালা একটাও কথা বলবি না। দাঁতে দাঁত চাপা শীতল সেই কণ্ঠস্বর—গলা টিপে মেরে ফেলব শুয়ার।

রাত শেষের পূর্ণিমা-চাঁদকে ঢেকে দেয় বেখাপ্পা আকৃতির একখণ্ড কালো মেঘ। ভুতুড়ে ডাক ছেড়ে উড়ে যায় প্যাঁচা। পূর্ণিমার রাতই বটে! এমন রাতে লক্ষ্মী প্যাঁচা এসে বসে ধানের গোলায়। খড়ের চালে। রবিকে যেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল সেখানে অবশ্য ধানের গোলা নেই। রেললাইনের ধারের এবড়োখেবড়ো মাঠ। ডোবা। জংলা গাছের ঝোপ। ট্রেনে কাটা পড়া কুকুরের অর্ধগলিত শরীর। পচা দুর্গন্ধ। পৃথিবীটা নোংরা, কুৎসিৎ, দুর্গন্ধময়।

—কটা খুন করেছিস্ হারামী?

—খুন? কোন খুন করিনি। বিশ্বাস করুন, কোনদিন খুন করিনি। খুন করেনি রবি? খুন করেছে। করেছে। মাছ চুরি করা বেড়ালটাকে তারের ফাঁস গলায় আটকে মারেনি? ছোড়দিকে যে কুকুরটা কামড়েছিল সেটাকে? বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে রাখা হয়েছিল কুকুরটাকে। বাবার কারখানা থেকে আনা খাঁজ কাটা প্লায়ার্সটা নিয়ে

এগিয়ে গেছিল রবি। যন্ত্রণায় কুকুরটা বিভৎসভাবে হাঁ করছিল। প্রথমে শ্বদন্ত, তারপর একটা একটা করে দাঁত উপড়ে নিয়েছিল পাঁচ আঙুলের নির্মম মুঠোয় ধরা প্লায়ার্সের এক একটা মোচড়। আলো আঁধারির এই রাতে হত্যাকারীদের মাঝে দাঁড়িয়ে সে কি অতীতের কর্মফল বুঝে নিতে এসেছে? এরা কি ঈশ্বর প্রেরিত নরকের দূত? বেড়ালটার পেটে বাচ্চা ছিল। গর্ভিনী বেড়ালটার খুব খিদে পেয়েছিল। ছোড়দির প্রেমিক শিভালরী দেখাবার জন্য সাইকেলে বসা ছোড়দিকে নিয়ে কুকুরটার গায়ের ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে দিয়েছিল।

হ্যাঁ সেগুলোও খুন। বিনা বিচারে নৃশংস জীবহত্যা—যেমন তাকে হত্যার প্রস্তুতি চলছে!

দীর্ঘকায় একটা ছায়া এগিয়ে আসে। রাত্রির স্তব্ধতার আড়ালে লুকিয়ে রাখার মত মানানসই তার চাপা স্বর।

—তোর নাম কি?

—রবি। রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ জানা।

—যাদব কি নাম বলেছিল রে?

জ্যোৎস্না পিছলে যায় পাইপ গানের গা বেয়ে। চারজন একসাথে বলে ওঠে রবি। রবি।

ইচ্ছা করছিল চিৎকার করে বলার। পারল না। ওর গলা কাঁপছিল।

—আপনারা অন্য কোন রবিকে খুঁজছেন। বিশ্বাস করুন, আপনাদের পায়ে ধরে বলছি, কোনদিনও না, একটা খুনও করিনি। পাড়ার ছেলেদের ছাড়া আর কাউকে চিনিও না। বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন, সত্যি, সত্যি বলছি। কিভাবে ওদের সে বোঝাবে!

রবি নামে নিশ্চয়ই কোন খুনী আছে। কিন্তু কোন রবি?

পাঁচটা মুখ একে অন্যের দিকে তাকায়।

—এখানে?

—ডোবার ধারে নিয়ে গেলে…।

—এতটা টেনে নিবি ?

রবীন সাহা। ওদের পাড়ার রবীন সাহা। লোকটার ডাক নাম ·· হ্যাঁ রবি, হতে পারে। কিন্তু লোকটাতো প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার। তাতে কী ? ওর দাদু তো স্কুল মাস্টার ছিল। ধরা পড়ার আগে কেউ ভাবতে পেরেছিল লোকটা কট্টর টেরোরিস্ট। রবীন সাহাও রাজনীতি করতে পারে। ছেলেদের ক্ষেপিয়ে হয়তো চরমপন্থী দল বানিয়েছে। চিহ্নিত হবার ভয়ে সবসময় রাজনীতির বাইরে থেকেছে সে। রাজনীতি মানে তো আদর্শের পার্থক্য নয়, ব্যক্তিগত আক্রোশ। ভুল হয়েছে নিদেনপক্ষে একটা রাজনৈতিক দলের ছাপ্পা গায়ে লাগিয়ে রাখলে কোন ক্ষমতাশালী লোকের নাম বলা যেত। এদের চেনাজানা কাউকে পেয়েও হয়তো যেত। পিঠে ধাক্কা খায় সে।

— চল্ শালা। চল্।

অসমতল মাঠ ভেঙে এগিয়ে যায় পাঁচ হত্যাকারী। মাঝে তাদের শিকার – রবি। হাঁটে সে, এক পা, দু-পা। ঝুঁকে ঝুঁকে। যেন স্বপ্নের ঘোরে।

রবিশেখর মণ্ডল। পাড়ার একেবারে কোণার বাড়ির বুড়োটা। ডাক নাম···শোনেনি কখনো···রবি···হলেও হতে পারে। লোকটার সাথে এদের যোগাযোগ···রেলের মাল গুদামের বড়বাবু। গুদামের মাল-চুরির চক্র। কিন্তু লোকটা···লোকটাকে তো সে দেখেছে—চোখে, মুখে, পোশাকে—ছাপোষা কেরাণী। হাতে গোল হাতল ওয়ালা ব্যাগ, শার্টের পকেটে কালির ছোপ, পায়ে প্লাস্টিকের চটি। এগুলো অবশ্য ক্যামোফ্লেজ হতে পারে। তবু···তবু···লোকটা-লোকটা বড়জোর ঘুষ নিতে পারে। কিন্তু খুন !

—কোথায় ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

ঘাড়ের পাশে গ্যাঁতে সজোরে ঘুষি পড়ে। থরথর করে কাঁপতে থাকে শরীর। মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে লালা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে যায়। শরীরটা ভেঙে পড়ে মাটিতে। ফোঁটা ফোঁটা পেচ্ছাপে ভিজে যায় লুঙ্গি।

—মেশিন্ চালাবো।

—দাঁড়া।

যন্ত্রণা। একরাশ যন্ত্রণা। ঘাড় শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

যাকে এরা যন্ত্রণা দিতে চাইছে সেই রবি—অনেক খুন করেছে সেই রবি। নিশ্চয়ই এদের সঙ্গী-সাথীদের। খুনী রবির সাথে তার কি মিল আছে? নামের? মুখের? শরীরের গঠনের? আলো মানুষের বহিরাঙ্গ চিনিয়ে দেয়। বধ্যভূমিতে মরা জ্যোৎস্না বাদে অন্য আলো নেই। কিন্তু বাড়িতে? সেখানে তো আলো ছিল। তবু এরা কোন পার্থক্য খুঁজে পেল না!

তাহলে আসল রবিকে এরা কোনদিন চোখেই ছাখেনি?

আসল রবি বোধ হয় নাম পাল্টে তার পাড়াতে অথবা আশেপাশে রয়েছে। আসল রবি বেঁচে গ্যাছে। বেঁচে আছে। রাতঘুম ভেঙে দেখল, না দেখলেও বুঝতে পারল, প্রতিহিংসা নিতে এসে এরা কেমন ভাবে অন্য রবিকে টেনে নিয়ে গেল। আসল রবি কী করছে এখন? হয়ত ভোরের অপেক্ষায় আছে পাল্টা আক্রমণের জন্য। এদের মুখ দেখে থাকলে তার বর্ণনা দেবে সঙ্গীদের। আগামী রাতে এই পাঁচজনের একজন অথবা এদের সাথে নামের বা চেহারার মিল আছে এমন কাউকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে অন্য এক বধ্যভূমিতে।

উপুড় হয়ে পড়ে থাকা রবিকে চিৎ করে দিল ওরা। আকাশে অথর্ব শরীর নিয়ে গোল চাঁদ। একটা মাত্র তারা। কয়েকখণ্ড মেঘ। শক্ত হয়ে আসা ঘাড় শেষবারের মত ঘোরালো রবি—না তার সাহায্যের জন্য কেউ নেই। কেবল বোবা বৃক্ষজগৎ আর পাঁচজন হত্যাকারী।

দূর থেকে ভেসে আসে কুকুরের একটানা চিৎকার। কোন পাড়ায় চোর ঢুকেছে? নাকি সেখান থেকেও কোন ভুল রবিকে তুলে আনা হচ্ছে হত্যার জন্য। তাকে হত্যা করা হবে এটা নিশ্চিত। তবু কেন তার মনে হচ্ছে এখনো সে বাঁচতে পারে। খুনের অপরাধে অজানা অচেনা যাদব তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। কারণ সে জানে না। এদের

'কিছুতেই বোঝাতেও পারছে না যাকে এরা চাইছে সে ও নয়। কিন্তু এত নিশ্চিত হল কেমন করে যে সে অপরাধী! ঘুমের ঘোরে মানুষ কথা বলে, হাসে, হেঁটেও বেড়ায়। যন্ত্রণায় ভাঙাচোরা শরীরটা শিউরে উঠল—ঘুমের ঘোরে তাকে দিয়ে কি কেউ একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে যা সে নিজেও জানে না!

উবু হয়ে বসল এক হত্যাকারী, ছেঁড়া-খোঁড়া জ্যোৎস্না লেপা মুখ ঝোঁকালো তার মুখের ওপর।

—মরে গেল নাকি?

—কোপ বসিয়ে দে।

—যাদব বলেছিল কোঁচড়ে সব সময় মেশিন রাখে। এর তো···। জ্যোৎস্না ভেঙে আর্তচিৎকারে উড়ে যায় দুটো কাক। ভোর হয়ে এল বুঝি। চাপা স্বরে বলে একজন আর দেরি করিস না। দেশলাই জ্বলে ওঠে। এক পলকে ছ্যাখা যায় কালো মোটা ঠোঁট। ঠোঁটে চাপা সিগারেট।

—এটা শেষ করে নিই। গা গরম হচ্ছে না।

—চোখ রাখিস।

—আরে হ্যাঁ। নড়লেই চালাবো।

এরা ওকে খুনী বানাচ্ছে। যেন খুন করার জন্য জোর করে খুনী বানানো। অবচেতনে—ঘুমের ঘোরে যদি সে খুন করেই থাকে তাহলেও যে তাকে দিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সে-ই আসল অপরাধী। ছায়া শরীরগুলোতে লেগে আছে অলস ভঙ্গী। কেউ দাঁড়ানো। কেউ পা ছড়িয়ে বসা। ঠোঁটের কাছে আগুনের ফুল্‌কি কখনো জ্বল-জ্বলে, কখনো নিস্তেজ। গা গরম হচ্ছে ওদের। ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে তাকে জবাই করবে ওরা। রবিকে খুন করা আর একটা আরশোলাকে চট্‌কে মারা একই ব্যাপার।

নিস্তেজ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকলে আরো কিছুক্ষণ হয়ত মূল্যহীন জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে। মৃত্যু ধাবিত এই সামান্য

বেঁচে থাকাটুকু যে কী গ্লানিময়! খাঁচাকলে আটকে পড়া ইঁদুরগুলোকে রবি বালতির জলে চুবিয়ে একটু একটু করে মারত। এক ঝলক্ বাতাসের জন্য ইঁদুরগুলো জলের ওপরে কোনরকমে নাকটা তুললেই কাঠির খোঁচা মেরে আবার ডুবিয়ে দিত জলের গভীরে। বার বার। কিন্তু ইঁদুরগুলো যদি জোর করে দম আটকে জলের তলায় পড়ে থাকত?

বহু দূর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে ভেসে আসে মালগাড়ির শান্টিং-এর শব্দ ট্রেনের ক্লান্ত হুইসেল। স্যাঁত-স্যাঁতে বাতাস ছুঁয়ে যায় তার ক্ষতবিক্ষত শরীর। নাকের ডগায় যুক্তি-বিচারহীন মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলিয়ে তাকে নিয়ে খেলা চলছে।

সেই নির্মম খেলা দীর্ঘায়ত হত না—দম বন্ধ করে ইঁদুরগুলো জলের তলায় ডুবে পড়ে থাকলে। মৃত্যু আসত। অনিবার্য ভাবেই আসত। সেই মৃত্যু শেষ করে দিত হত্যা খেলার আনন্দ। যন্ত্রণা দেবার তৃপ্তি। নড়াচড়া করার অর্থ সে জানত। নিজের মৃত্যুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে আনা—আত্মহত্যারই নামান্তর। প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা রবির ছিল না। তবু শরীরের শেষ শক্তি নিংড়ে সে উঠে বসল··· □

দানেশ আলম চৌধুরী

খুমেইনির সিংহাসন

কাঁদতে কাঁদতে মারুফা যেদিন বাপের বাড়িতে চ'লে আসলো; সেদিনই ওর বাবার পক্ষাঘাত শুরু হোলো। মারুফার বাবা—ফজল মিঞা কাঠের কাজ ক'রে এ্যাত্তো বড়ো সংসারটা টানতে টানতে পঁয়ষট্টিটা বছর পার ক'রে দিয়েছেন। তবুও তাঁর পরিশ্রমের কোনো কমতি ছিলো না। অন্যের বাড়িতে, এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ছুটতেন দিন-দিন, মাস-মাস ধ'রে কাজ করতে—কাঠের। বেশ কিছু টাকা পয়সা নিয়ে মাসে, দু'মাসে, হপ্তায়—একদিন আসতেন। মারুফার মাকে খরচাপাতি দিয়ে চ'লে যেতেন। মারুফারা চার বোন এক ভাই। ভাইটা ছোটো। প্রাইমারী স্কুলে পড়ে এখন—মারুফার বিশেষ অনুরোধেই চার বোনের সবাইতো প্রথানুগভাবে—বাংলা ছেড়ে গ্রামের মাদ্রাসায় আরবী পড়তো। কোরআন্ শরীফ্, হাদিশ্ শরীফ্,...মসলা...ইত্যাদি ধর্ম বিষয়ক শিক্ষায় শিক্ষিত করানোর ওপর গ্রামের মওলানা হজ্‌রত্ করীম আলী খুব জোর দেন। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে গার্জেনদের বোঝান—ইহকালের সবকিছুই অস্থায়ী সুতরাং, পরকালের রাস্তা খোঁজা খুবই দরকারী। গ্রামের অধিকাংশ ঘরই মুসলমান সম্প্রদায়ের। উনি তাই ছেলে মেয়ে ধ'রে ধ'রে ভর্তি করান তাঁর মদ্রাসায়। তা বেশ চলে তাঁর। এখন আরবী পড়া প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ের বাধ্যতামূলক করেছেন উনি। নিজের জোরেই। উনি এ গ্রাম, সে গ্রাম থেকে পাপ, নাপাক হঠাতে চান। এজন্য তিনি জান্ কবুল করেছেন।

মারুফাও ঐখানে ভর্তি হয়েছিলো বাধ্য হয়েই; বাবা ও মৌলবী সাহেবের জবরদস্তিতে। প্রথমতঃ, মারুফা ছোটোবেলায় অঙ্ক, বাংলা, ভূগোল—সবকিছুই ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলো। বাবারও ইচ্ছে

ছিলো তিন মেয়ে আরবী পড়ছে, এবার এটাকে উনি বাংলা শেখাবেন। ইদানিং বাংলা স্কুলের গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা এলাকায়ও সাড়া ফেলেছে। আর এজন্যেই মৌলবীদের হিংসা। ছাত্র ছাত্রী পাকড়ানোর ধর্মীয় অজুহাত। মারুফাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে ভর্তি করেছিলেন হজ্‌রত্‌ আলী সাহেব।

বাড়িতে এখনও তার দুই বোন আছে। ওদেরও বিয়ে হয়েছিলো। ···তারপর···তালাক্‌···। পুনরায় বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন ওদের। কিন্তু সেটাও টেঁকেনি। তারপর আবিদা, আলিফা দুজনারই মন তেতো হ'য়ে গেছে। ওরা ভেবেছে—পুরুষরা ক্ষমতার দণ্ড হাতে ওদের চালায় শুধু; আর ওরা কাঠের পুতুল···।

মারুফাকে যেদিন তালাক্‌ দেওয়া হয়, সেদিন মারুফা কাঁদতে কাঁদতে বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলো। বাবা ছোটো মেয়ের কান্না শুনে বারান্দায় অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেছিলেন। তখনই পক্ষাঘাত। আজও উনি ভাবেন দিনরাত উজাড় ক'রে। কেন এমন হোলো, কেন এমন হয়।

······তিনমাস কেটে যাবার উপক্রম। মারুফা শুনেছে লতিফ্‌ নাকি আর একটা বিয়ে করছে। কথাটা ওর বিশ্বাস হয় না। একদিন মৌলবী সাহেব এসে ওদের বাড়িতে জানালো ওর বাবাকে ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে—লতিফ্‌ নাকি ফের নিকা·· করবে, মারুফাকে। মারুফার বাবা না ক'রে দিচ্ছিলেন বারবার। সব শেষে বাবা মৌলবীর শত বোঝানোর কৌশলে ধরা প'ড়ে যান এবং মারুফার জীবন গড়ার কথা শোনান। বাবার মনটাও শেষে কাঁদতে কাঁদতে সায় দেয়। মারুফা সব শুনেছে লুকিয়ে। মাকে ব'লেও দিয়েছে—তার আর বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। মা বুঝিয়েছেন—তোর বাবা বিছানায়। কোন্‌দিন ইন্তেকাল করেন ঠিক নেই। একে দুজনকেই পুষছি; তোকেও যদি পুষতে হয় তাহলে সংসারটা চলবে কিসে—বল্‌ মা। নয়তো আমাদের ভিক্ষা ছাড়া আর···রাজী হ'য়ে যা মা।

···কিন্তু আবার যদি ওমনি করে···। আবার তালাক্‌ দেয়···।

কী হবে তখন! আশঙ্কার কালো মেঘ দেখে মারুফা বলে।

—কী হবে আবার। মৌলবী সাহেব যা ফতোয়া দেবেন তাই করবো। আল্লা তায়ালার উপর ছেড়ে দিবো। তাছাড়া মৌলবী সাহেবের শরীয়তী শালিশ্ কামটি যা করবে মেনে নিবো। গরীব মানুষের আল্লা ছাড়া আছে কী বল্।

মারুফা চুপ ক'রে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তবুও ভেতরটা ওর বারুদের মতো ফেটে ওঠার অপেক্ষায় ভুরু ভুরু করে।···ছি! এ অনাচার! এ অন্যায়···। কিন্তু তার কথাতো কেউ শুনবে না! অন্ততঃ কোনো পুরুষ মানুষ। যেখানে মেয়েদের কথা বলার স্বাধীনতাই সীমিত ···এই পুরুষ-শাসিত সমাজে।

মৌলবী সাহেব ও তার শালিশ্ কমিটি এবারেও অন্যবারের মতো ফতোয়া দিয়েছেন—মারুফাকে একেবারে প্রথমে লতিফ্ আবার নিকা করতে পারবে না। হালফিল্ একটা শরীয়তী পুস্তিকার আরবী-উর্দুর বাংলায় ভাঙা ভাঙা তর্জমা ক'রে শোনান শালিশে। ঠিক হয়—মারুফাকে অন্য একজনার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে—এটা শরীয়তী বিধান। এখন ঐ স্বামী যদি মারুফাকে তালাক্ দেয় এবং কেবলমাত্র তখনই এবং তারপরই লতিফ্ মিঞা মারুফাকে নিকা করিতে পারবে। সভায় গুঞ্জন ওঠে···কে নিকা করবে মারুফাকে! অনেক অ-বিবাহিত ছোকরার নাম ওঠে। মৌলবী সাহেব জোরে বলেন— ···হ্যাঁ, একটা কথা—, ···মারুফাকে শাদী ক'রে ওকে যদি তালাক্ না দিতে চায় ওর স্বামী (অস্থায়ী) তাহলে কিন্তু লতিফ্ মিঞার নিকা হওয়া সম্ভব নয়। অতএব লতিফ্ মিঞা ভাবুক গভীরভাবে—কার সঙ্গে নিকা দিলে ব্যাপারটা সহজে মিটে যাবে। সভা শেষে একটা গোপন সিদ্ধান্ত হ'য়ে গেল। সভা শেষ হোলো।

মারুফা বাড়িতে বসে লোক মারফত শুনতে পেয়েছে—ওর নিকা হবে নাকি মৌলভী সাহেবের সঙ্গেই। যার এখনও চারটে বিবি বর্তমান। অবশ্য ওদের মধ্যে বাকি তিনজন এই ধরণের কেসে পড়েই বিবি

হয়েছে। অর্থাৎ মৌলবী সাহেব যেভাবে মারুফাকে বিয়ে করবেন। তারপর তালাক্ দেননি। ফলে ওরা বিবির মর্য্যাদা পেয়েছে মৌলবী সাহেবের ইচ্ছেয়। কারণ উনি তালাক্ না দিলে তো ঘটনাটা অন্য-রকমই হবার কথা। মারুফাও ভাবছে—আচ্ছা,…যদি লতিফ্ তাকে নিকা করতেই চায়—তাহলে এরকম নিয়ম ধ'রে কেন? মৌলবী সাহেব যদি তালাক না দেয়! তখন কী হবে! ওর পঞ্চম বিবি হয়ে কাঁদতে কাঁদতে মরতে হবে মারুফাকে। কান্না পায় ওর ভীষণ। কিছুই করার নেই এই মুহূর্তে। ওসবই নির্ভর করছে মৌলবী সাহেবের ওপর। কারণ লতিফের সঙ্গে নাকি ওনার কথা হয়েছে গোপনে। মৌলবী সাহেব রাজী ছিলেন না; তাকে দুহাজার টাকা লতিফ্ দেবে। কথা হয়েছে।…গোপন মজলিশে। আচ্ছা, মারুফা না হয় মেয়ে হয়ে মেনে নিচ্ছে অগত্যায় শরীয়তী বিধান; কিন্তু লতিফ্? ও তো মরদ। মরদের একটা ইজ্জত্ আছে; তাকত্ আছে। আশ্চর্য! অদ্ভুত ঠেকে মারুফার কাছে। নাহ্, এসব বরদাস্ত হয় না! ও পাগল হয়ে যাবে। বুদ্ধিমতী মারুফা এসব মানতে পারেনা। ও বিদ্রোহ করবে ঠিক করেছে মনে মনে। কিন্তু তার প্রতিবাদকে তো সবাই টুঁটি টিপে মেরে ফেলবে; তখন তো যে কে সেই--। ত… অসহায় মারুফা বিকাল কাটায় সন্ধ্যা'র অপেক্ষয়। আজই মৌলবী সাহেবের সঙ্গে তার নিকা হবে। তার সঙ্গে একটা রাত পুরোপুরি স্বামী-স্ত্রীর মতো কাটাতে পারলেই নাকি মৌলবী সাহেব তুষ্ট হয়ে ফজরের পর তালাক্ দেবেন। তারপর মারুফা বাড়ি আসবে। তারপর সন্ধ্যায় আবার লতিফের সঙ্গে নিকা। সে কী একটা খেলার ফুটবল! যে যার ইচ্ছে লাথি মারবে আর…।

মারুফার বিয়ের রাত কেটে ভোর হয়েছে। মৌলবী সাহেবের বাড়িতে গ্রামের শরীয়তী কমিটির সবাই এসেছেন। উনি টাকাও পেয়ে গেছেন। এখন উনি বলছেন…না আমি তালাক্ দিতে পারিনা। একটা মেয়ের সর্বনাশ করলে আমি খোদাতালাকে কী জবাব দেবো

আখেরে ··। আর মারুফার জন্যে দু'বেলা দু'টো রুটি আল্লা আমাকে দিয়েছেন। ···মজলিশে বিতর্ক, গণ্ডগোল বাঁধে। মারুফা ঘর থেকে সব শুনছে। কেউ বলছে এটা অন্যায়। কথা দিয়ে কথা না রাখলে আখেরে জবাব দিতে হবে মৌলবী সাহেবকে। মৌলবী সাহেব বলেন—আমি কিন্তু সম্পূর্ণ শরীয়তী নিয়ম মেনেই একথা বলছি। এই দেখুন · পরিষ্কার লেখা আছে কেতাবে --বলে কেতাব দেখান। সবাই চুপ মেরে যায়।

মারুফা বুঝতে পারে, তার দুরন্ত যৌবনই, সৌন্দর্য্যই যত সর্বনাশের মূল। যা কোনো বয়স মানে না। সম্পর্ক মানে না। বাবার তুল্য নিজের ওস্তাদ, মৌলবীর বিছানায় সঙ্গী হয়েছে সে···। আরও কত কী হবে! এমন সময়- বাইরে প্রচণ্ড গণ্ডগোল শোনা যায়। লতিফ্ মিক্রা তার কয়েকজন দোস্ত ইয়ার সহ চিৎকার ক'রে বলছে- মারুফার কোনো দোষ ছিলো না....আম্মাজানের কথায় শুধু ওকে তালাক্ ·। কিন্তু আপনি জেনে শুনে সর্বনাশ করবেন না মৌলবী সাহেব। মারুফার নিজস্ব মতামত নিন···ও আপনার পত্নিত্ব মানতে রাজী কি না....!

মারুফার বুকটা কাঁপতে থাকে নতুন আলো দেখে। ও কী বলবে ···ওর জানা আছে। তবুও মৌলবী সাহেব বলে ওঠেন—আমি তালাক্ না দিলে ওর কোনো কথাই খাটবে না এটাই শরীয়তী নিয়ম। ক্ষেপে ওঠে লতিফ্। রক্ত মাথায় ওঠে তার। সামনের বেড়াটা ভেঙে একটা পুরনো বাঁশ তুলে এনে সজোরে মারেন মৌলবী সাহেবের মাথায়। লুটিয়ে পড়েন এই গ্রামের শরীয়তী হাদিশবেত্তা ওস্তাদ— রক্তাক্ত অবস্থায়···।

লতিফ্ দৌড়ে গিয়ে মৌলবীর দাওয়ায় দেখে জানালা ধরে মাটির দিকে তাকিয়ে অঝোরে কাঁদছে মারুফা। ঘৃণার তীব্র অনুভূতি তার ঠোঁটে···গতকাল যদি এই মর্দানি দেখাতেন···আমরা ইতিহাস হয়ে যেতাম···কিন্তু ··ব'লে হাতে ধরা বিষের পুরিয়াটা ঢেলে দেয় গলায়··· মারুফা। তারপর দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়।

লতিফের মাথাটা ঘুরতে থাকে। দরজায় ধাক্কা মারতে থাকে, তবুও দরজা খোলেনা। ভাঙেও না। বাইরের লোকজন তখন জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় লতিফ্‌কে। মৌলবী সাহেবের নাকি দাফন্‌ হবার পর বিচার হবে লতিফের। প্রকাশ্য দিনের বেলায়, খোলসা মজলিশে। বিচার করবেন পাশের গ্রামেরই, প্রয়াত মৌলবী সাহেবের শিষ্য। যাকে আজকেই ইমাম্‌ বানানো হবে। আর যিনি খুমেইনিরই মতো রায় দিয়ে যাবেন ইচ্ছে মাফিক…।

…বসবেন আর এক খুমেইনি; তার উত্তরাধিকার সূত্রে নির্মিত সেই চরম ক্ষমতার সিংহাসনে…। □

মনোজ চাকলাদার

স্বাধীনতা দিবসের গান

১

ডালমিয়া পার্কের পাশ দিয়ে মিছিল আসে। লরি, বাস, প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি জ্যাম তৈরি করে।
সামনে পেয়ারা আম জাম বিক্রি হয়। স্টেট ব্যাংক থেকে বেরিয়ে বিবাহিতা, অবিবাহিতা মহিলা কয়েকজন ফলের দোকানে ভিড় করে। তাদের মুখ সব ফলের মত হয়ে যায়। ঠোঁটের ওপর মৃদু কম্পন হাসি। কোন শব্দ নেই। চোখের ওপর উজ্জ্বল খুশি।
রাস্তায় গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ। মিছিলের আওয়াজ। মানুষ মানুষীর বাক্যের আওয়াজ।
মিছিল থামিয়ে দিয়েছে সব গাড়ির গতি। তীক্ষ্ণ কর্কশ রোদ। ছাতা মাথায় কয়েকজন ফুটপাথ ধরে, কিছু লোক পথের মাঝ দিয়ে ঋষি বঙ্কিম সেতুর দিকে যায় কিছু ওদিক থেকে বিপরীত দিকে আসে। ব্যস্ত মানুষেরা ব্যস্ত।

এশিয়ার মুক্তি সূর্য ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও
যুব নেতা (.....................) যুগ যুগ জিও
বন্দে মাতরম
বন্দে মাতরম

মোড়ে মিছিল এসে থামে। হাতে কয়েকজনের ত্রিরঙা পতাকা। পতাকা কখনো ওপরে উঠছে কখনো নিচে নামছে। কখনো তাড়াতাড়ি

করে নামছে আবার তাড়াতাড়ি উঠছে। কখনো আড়াআড়ি কখনো কাটাকাটি। এদিক ওদিক করে ফুল হচ্ছে কখনো অঙ্কুশের ফলা।

বাস স্টপেজের শেডের নিচে এসে দাঁড়ায়। পাশের ফুটপাথের দোকানে পাতা বেঞ্চের ওপর বসে কয়েকজন। চা খায়। তারা উঠে দাঁড়ায়। মিছিলের ছেলেরা বেঞ্চ দখল করে নেয়। সিঙাড়া দেওয়া হয় প্রত্যেককে। গ্লাসে কয়েকজনকে, কয়েকজনকে ভাঁড়ে চা দেওয়া হয়।

১ ॥ (চা খেতে খেতে) ও মালেরা এল না কেন

২ ॥ শুধু চাকরি বাগাবার বেলায় আছে

৩ ॥ ঢপ দিয়ে দিয়েই গেল

১ ॥ কাঠ ফাটা রোদে আমরা সালা বেরোতে পারি—সব সালা ধান্ধাবাজ—

২

ক্যামেরা প্যান করে রাস্তায়। সাঁ করে প্রাইভেট কার চলে যায়। লোকভর্তি বাস চলে যায়। কয়েকটি ছেলে (পনের, ষোল) শ্লোগান দিতে দিতে এগোয়। বঙ্কিম সেতুতে হুসহাস বাস চলে যাচ্ছে। লরি চলে যাচ্ছে। লোক আসছে লোক যাচ্ছে। ডালমিয়া পার্কের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বয়স্ক লোক পেচ্ছাপ করতে থাকে। কোন আড়াল নেই। সামনে আরও কয়েকজন ভিখিরি মেয়েছেলেও আছে। কোন আবডাল নেই।

ক্যামেরা ঘুরে যায় পার্কে। কয়েকজন পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের পুরুষ মেঘলা রোদে সর্টস পরে খালি গায়ে ফুটবল খেলছে। মাঠের পাশে দর্শক দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। সম্ভবত কোন অফিসের খেলা। ক্লোজ আপ। হাতঘড়ি। সময়—একটা। মিনিটের কাঁটা ঘুরতে

ক্যামেরা প্যান করে মিছিলের দিকে। একটি আঠার উনিশ বছরের ছেলে হাত তুলে শ্লোগান দেয় অন্যরা ধুয়া দেয়।

লুটে পুটে খেয়ে লে বামফ্রন্টের আমলে
ব্যাংক ডাকাতি করে লে বামফ্রন্টের আমলে
গাড়ি বাড়ি করে লে বামফ্রন্টের আমলে
নারী ধর্ষণ করে লে বামফ্রন্টের আমলে

ক্যামেরা প্যান করে ফুটপাথে। অর্ধ উলঙ্গ পুরুষ শুয়ে ধূলোয়। গায়ে ছেঁড়া জামা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ে ছাতা পড়েছে। বোঝা যায় স্নান করেনি বেশ কয়েকদিন। সাবান তো নয়ই। মিছিল এগোয়। একজন পথচারী থমকে দাঁড়ায়। অন্যরা পায়ের গতি কমিয়ে ফেলে সম্ভবত শ্লোগানের বিভৎসতায় অথবা চমকতায়।

লুটে পুটে খেয়ে লে বামফ্রন্টের আমলে
ব্যাংক ডাকাতি করে লে বামফ্রন্টের আমলে
গাড়ি বাড়ি করে লে বামফ্রন্টের আমলে
নারী ধর্ষণ করে লে বামফ্রন্টের আমলে

৩

রোদ জাঁকালো ভাবে ওঠে। সবাই একটু সচেতন হয়। মিছিলের ছেলেরা যন্ত্রের মত হাত মাথায় তোলে। শ্লোগান থেমে যায়। অন্য একটি নীল জামা খয়েরি প্যান্ট যুবক শ্লোগান শুরু করে।

এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও
যুগ যুগ জিও যুগ যুগ জিও
যুব নেতা (................) যুগ যুগ জিও
ছাত্র তুমি এগিয়ে বল বন্দে মাতরম
কৃষক তুমি এগিয়ে বল বন্দে মাতরম
শ্রমিক তুমি এগিয়ে বল বন্দে মাতরম

একটা ট্যাক্সি প্রায় হুমড়িয়ে পড়ে। একটি ছেলে পড়ে যায় ধাক্কা খেয়ে। ছেলেরা ট্যাক্সিটাকে ঘিরে ধরে। শ্লোগান বন্ধ। রাস্তার সকলের চোখ ওদিকে চলে যায়। ট্যাক্সিওয়ালা হাবাগোবা তাকায়। ক্ষমা চায় হাত জোড় করে। কয়েকজন ট্যাক্সির বনেটে লাথি মারে। দুয়েকজন চড়ে নাচতে থাকে।

ব্যোম ব্যোম তারক ব্যোম বলে ব্যোম তারক ব্যোম

একজন নেতা ধমক দেয়, কী হচ্ছে! ওরা থেমে শ্লোগান দেয়—

ট্রাফিক আইন ভাঙলো কারা বামফ্রন্ট আবার কারা

একজন শ্লোগান শুধরে নেয়—

ট্রাফিক আইন ভেঙে লে বামফ্রন্টের আমলে

ট্রাফিক আইন ভেঙে লে বামফ্রন্টের আমলে

নেতা গাড়িটা ছেড়ে দেয়। ট্যাক্সিটা প্রথম আস্তে আস্তে কিছুটা এসেই খিস্তি দিয়ে গতি বাড়িয়ে দেয়।

শ্লোগান দিয়ে মিছিল আবার শুরু করে।

লুটে পুটে খেয়ে লে বামফ্রন্টের আমলে

... .

৪

ক্যামেরা প্যান করে ফুটপাথে। সারি সারি ছেঁড়া পলিথিন শিট, ছেঁড়া চট, ভারি প্যাকিং কাগজের শিট, ছেঁড়া টারপলের ছাউনি দেওয়া ঘর। কোনটি তিনফুট, কোনটি চারফুট উঁচু। উলঙ্গ ছেলে এদিক ওদিক শুয়ে আছে। কোন সৌষ্ঠব নেই। মেয়েরা বসে আছে অশ্লীলভাবে। অধিকাংশ বুকে জামা নেই। বিভৎস, রুগ্ন গতিহীন স্তন।

নর্দমা দিয়ে ময়লা আবর্জনা যাচ্ছে। উৎকট গন্ধ। মল ভেসে যাচ্ছে অবিরল। একজন মহিলা উদোম গায়ে। কোমরে সামান্য

কাপড়। ময়লা। নীল পাড়। উরুর মাঝামাঝি থেকে কাপড় নেই। বসবার ভঙ্গি অশ্লীল। সামনে ভাতের থালা। ভাত খাচ্ছে। দুপাশে দুটো ন্যাংটো রুগ্ন, কালো, শীর্ণ শরীর, বড়ো মাথা শিশু। হামলে পড়েছে ভাতের থালায়। তিনদিকে তিনটে রুগ্ন শিশু তাকিয়ে আছে।
ক্যামেরা প্যান করে নর্দমায়। আনন্দবাজার পত্রিকার একটুকরো। ভেজা। ক্লোজ আপ। —'আমাদের চেয়ে গরীব দরদী কেউ আছে—' মুখ্যমন্ত্রী।
ক্যামেরা ধীরে ধীরে রেলিং ধরে। তারপর দূরে উঁচুতলা বাড়ি। শিরিশ গাছ। সবুজ। বাতাস খেলে। তারপর শরৎ নীল আকাশ। সাদা স্বপ্নের মত। মেঘ ভাসতে থাকে। শ্লোগান ভেসে আসে দূর থেকে—

লুটেপুটে খেয়ে লে বামফ্রন্টের আমলে

....

৫

মিছিল এগিয়ে গেছে ঋষি বঙ্কিম সেতু পর্যন্ত। ওর নিচে বেশ কিছু অসুস্থ মানুষ নোংরা বিছানায়, ছেঁড়া পাটিতে, খেজুর পাতার চাটাইতে শুয়ে বসে আছে। বেশির ভাগ মেয়েদের আদুর গা। পুরুষেরা প্রায় নেংটি পরে খালি গায়ে।
ক্যামেরা একজন মেয়েমানুষকে ধরে। গায়ের রং আরো ফরসা। মূলত রক্তহীনতা। চুল ফাটা। লালচে। শরীর খোলা। কোমরে ন্যাকড়া জড়ানো। উরু পর্যন্ত কোন ঢাকনা নেই। কোলে শিশু। রুগ্ন। মহিলার চোখ থেকে জল পড়ছে। জল গালের কোথাও শুকিয়ে ময়লা দাগ হয়ে রয়েছে। একজন জার্নালিজমের ছাত্র এগিয়ে যায়। কাঁধে ক্যামেরা। টেপ ঝোলানো অপর কাঁধে। বাঁ হাতে লেখার প্যাড ডান হাতে ডট পেন।

ছাত্রটি বসে। মেয়েমানুষটির কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। শিশুটি ভয় পেয়ে মায়ের স্তনের বোঁটা মুখে আরও ঢুকিয়ে দেয়। বাঁ হাতে মায়ের অপর স্তনটি জোরে আঁকড়ে রাখে। মেয়েমানুষটির নিজের শরীর ঢেকে রাখবার কোন প্রয়াস নেই।

কয়েকজন পথচারী কৌতূহলে দাঁড়ায়। ছাত্রটি বলে, আমি কয়েকটি প্রশ্ন করছি কাইণ্ডলি উত্তর দিন—

মেয়েমানুষটি কোন উত্তর দেয় না। সম্ভবত সব শব্দ বোধ হয় বোঝে না।

আপনি কোথায় থাকেন / কোন উত্তর নেই।

আপনার স্বামীর নাম / কোন উত্তর নেই।

আপনার কয়টি সন্তান / কোন উত্তর নেই।

আপনি ভয় পাচ্ছেন। এতে আপনার কোন ভয় নেই। আমি শুধুমাত্র স্টাডি পেপার জমা দেবার জন্য।

পথচারী একজন বলে, তোমার ভয় নেই। তুমি বল—

মেয়েমানুষটি কোন উত্তর দেয় না।

আপনার বাড়ি আগে কোথায় ছিল / কাঁদতে থাকে।

আপনার এখন জীবিকা / কাঁদতে থাকে।

আপনি বৃষ্টিতে কোথায় থাকেন / কান্না জোরে হয়।

এখন আপনার স্বামী নেই / কাঁদতে থাকে। চোখের জল গড়িয়ে গাল বেয়ে টপ করে স্তনের ওপর পড়ে কোলের ছেলেটি চুষে নেয়।

আপনার সমস্যা / কান্না। চোখের জল স্তনের ওপর পড়ে। শিশুটি খেয়ে নেয়।

ইন্দিরা গান্ধী কে জানেন / কান্না

আমাদের রাষ্ট্রপতি কে জানেন / কান্না

জ্যোতি বসু কে জানেন / কান্না

আপনি কোন ভাষায় কথা বলেন / কান্না
আপনি কোন প্রদেশের লোক / কান্না
এটা কোন জেলা / কান্না
আপনার সন্তানের নাম / কান্না
এর বাবার নাম / কান্না

ছাত্রটি রেকর্ড করা থামিয়ে দেয়। মহিলার দিকে তাকায়। শিশুটির দিকে তাকায়। ক্লোজ আপে মহিলার মুখ। কান্না। শিশুটির মুখের ক্লোজ আপ। ভীত সন্ত্রস্ত।

৬

মহিলার মুখ সমস্ত পর্দা জুড়ে। ধীরে ধীরে চোখ দুটোর ক্লোজ আপ। জল ভর্তি চোখ। জলের ফোঁটা। জলের ওপর ভেসে ওঠে বিধান রায়ের হাসি মুখ। হেঁটে চলেছেন বিধান রায়। কাঁপতে থাকে। জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। গালে। মহিলার কেঁপে ওঠা মুখ।

জলে ফুটে ওঠে ৬৭ সালের খাদ্য আন্দোলনের ছবি। দৈনিক বসুমতীর হেডলাইন—কৃষ্ণনগর ডুবুডুবু কোন্নগর ভেসে যায় রে—প্রফুল্ল সেন। সমস্ত পর্দা জুড়ে মহাত্মা গান্ধীর ছবি।

অজয় মুখোপাধ্যায়ের কর্মব্যস্ত ছবি। নির্বাচনী প্রচার। অজয় মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর—যত পার গুরু নিন্দে করে নাও নরক গুলজার আছে।

ঋত্বিক ঘটকের স্টিল ছবি শিশির মঞ্চে। উদভ্রান্ত চঞ্চল চলচ্চিত্র পরিচালকের শান্ত পরিচ্ছন্ন মৃত মুখ। পাটখড়ির মশাল এগিয়ে যাচ্ছে পরিচালকের মৃত মুখে। তাঁর 'লেনিন' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য। বাম-ফ্রন্টের বিজয় উৎসব। সুবোধ ব্যানার্জী মঞ্চে উঠছেন। পরের দৃশ্যে জ্যোতি বসু। মন্তব্য—কঅতো নেএতা……। পরের দৃশ্য গ্রামে জমির লড়াই।

মৃণাল সেনের 'আকালের সন্ধানে'র স্মিতা পাতিলের মুখ। লোড-শেডিংয়ের স্টিল ছবি দেখিয়ে past, present and future ...

মুখ্যমন্ত্রীর দৃপ্ত ভাষণ—আমরা তো দারিদ্র্য দূর করবার কথা ভেবেছিই ....তাদের জন্য সংগ্রাম করে চলেছিই.......। কোন শব্দ আর বোঝা যায় না।

অশোক মিত্রের মন্তব্য পর্দায় ফুটে ওঠে—নেতাজীর পর এ পর্যন্ত কোন নেতার এরূপ ব্যক্তিত্ব, এরকম ক্যারিসমা পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়নি।...

ধীরে ধীরে পর্দায় মহিলার কান্না মুখ ফুটে ওঠে। তারপর স্থির হয়ে যায়।

৭

লং শট-এ দূরে মিছিল। ডি. এম. বাংলোর কাছে গেছে।

শ্লোগান শোনা যায়—লুটেপুটে খেয়ে নে বামফ্রন্টের আমলে। মিড শট-এ একজন চশমা পরা সার্টপ্যান্ট পরা লোক মন্তব্য করে, কোন পলিটিক্যাল শ্লোগান নেই। ক্লোজ আপ। বাঁকা হাসি।

৮

সমস্ত পর্দা জুড়ে The Sunday Statesman-এ প্রথম কলামের ক্লোজ আপ।

Zail Singh's Call To End Poverty

Calling for the removal of poverty, hunger, unemployment and disease. President Zail Singh said today that the living standard of the people should be raised further. The country was facing a testing time, he added.

The Statesman

Today, Independence day
Being a holiday in the offices of the Statesman, there will be no issue of this edition dated Monday, August 16.

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর ঃ
The Statesman এর পর বেরিয়েছে।

পর্দায় চোখের জলে ফুটে ওঠে,—
Disruptive for as must be tamed –Zail.
·· these acts of violence are trying to put the clock back so that poverty, hunger, ignorance disease and like calamities overtake the country.
পর্দা থেকে লেখা সরে যায়। চোখ দেখা যায় সমস্ত পর্দা জুড়ে। চোখে জল। চোখ ক্রমশ লাল হতে থাকে। গনগনে লাল। লাল ক্রমশ আগুন হতে থাকে। আগুন জ্বলতে থাকে।

৯

বৃষ্টি নেমেছে। চারিদিক কালো মেঘে ঢাকা। রাস্তায় জল জমেছে। জল ছিটিয়ে ট্যাক্সি, বাস ছুটে চলেছে। ছুটির দিন। রাস্তা ফাঁকা। ফুটপাথে জল উপছে এসেছে। নর্দমা ভরে গেছে জলে। নর্দমা ফুটপাথ রাস্তায় জল একই সমতলে। জলে ভেসে গেছে পার্ক।
ঝুপড়ির ভেতর ঝপঝপ করে জল পড়ছে। সাজানো সংসার ভেজা। জলে ভাসছে কৌটো, থালা, বাটি। শিশুরা খেলার নৌকো করে খুশি চোখে তাকিয়ে। মেয়েমানুষটি আকাশের দিকে তাকিয়ে। হাঁ করে রয়েছে মুখ। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। মাঝে মাঝে সে জল গিলে নিচ্ছে। মায়ের দেখাদেখি শিশু দুটি চোখ বুঁজে আকাশের দিকে

তাকিয়ে।. হাঁ করে বৃষ্টি খেতে থাকে। আবার চোখ খোলে মায়ের দিকে তাকায়। মা চোখ বুঁজেই আছে। সারা শরীর উদোম। শরীর বেয়ে বেয়ে জল পড়ছে শরীরের অবতলে। স্তনের বোঁটা বেয়ে জল পড়ছে। একটি শিশু বোঁটার সামনে জিভ রাখে। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

ওরা বেরিয়ে আসে। শিরিশ গাছ বেয়ে কলকল করে জল গড়িয়ে পড়ে। শিশু দুটি তাকিয়ে থাকে। মাকে বলে, মা জল খাব। চোখ বুঁজে আছে। বৃষ্টিধারায় মুখ ভেসে যাচ্ছে। কোন উত্তর নেই। শিশু দুটি ছুটে যায়। শিরিশ গাছের কাণ্ড বেয়ে জল নামছে দেখতে থাকে।

শিরিশ গাছ বেয়ে জল নামে। শিশু দুটি তাকিয়ে থাকে। জলের ধারা নামতে থাকে। অঝোরে বৃষ্টি পড়ে। সমস্ত শরীর বৃষ্টি ধারায় স্নাত। ওদের শরীর বেয়ে জলের ধারা নেমে যায় জলে। ওরা কৌতূহল নিয়ে দেখতে থাকে জলের ধারা। জলের ধারা থামিয়ে দেবার জন্য একটি হাত বাড়ায়। জলের ধারা চেপে ধরে। হাত উপচে জলের ধারা নামতে থাকে। ফোয়ারার মত কিছু ছিটকে ওদের চোখে মুখে পড়ে। ওরা ছেড়ে দিয়ে দুপা পিছিয়ে দেখতে থাকে। হেসে ওঠে। এবার অন্য শিশুটিও ধরতে যায়। ধরে। ওর হাত উপচে জল পড়তে থাকে। হাত তুলে নেয়। জলের ধারার দিকে তাকিয়ে থাকে। এরকম কয়েকবার করে। শিশু দুটি হাসতে থাকে। ওদের মা এখনও আকাশের দিকে মুখ করে রয়েছে। হাঁ করে। বৃষ্টির জল মুখে পড়ে। চোখের গর্তে জল ভরে যায়।

শিরিশ গাছ থেকে ময়লা জলের ধারা একসময় বেশ ফটফটে হয়। একটি শিশু জলের ধারায় মুখ দেয়। মুখ চোখে জল ভরে যায়। ঝরণার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঝরণার শব্দে চারিদিক ভরে যায়। শিশুটি আবার ঝরণায় মুখ দেয়। খেলতে খেলতে জল খায়। ওর দেখাদেখি অপর শিশুটিও জল খায়। এভাবে পালা করে ওরা জল

খেতে থাকে। একটি শিশু যখন জলের ধারা থেকে জল খায় অপর শিশুটি ওপরের দিকে তাকায়। সবুজ আর সবুজ। সবুজ পাতায় তার চোখে এক মোহ ছড়িয়ে পড়ে। সে অবাক হয়ে দেখে পাতার ফাঁক দিয়ে গাঢ় ধুসর আকাশ। আকাশ থেকে জল পড়ে।

জল অবিরাম ধারায় পড়তে থাকে। জল কখনো ফটফটে। কখনো লাল। যেন রক্ত গড়িয়ে আসছে। রক্তের ধারা। ওরা রক্ত পান করে চলে। মুখে রক্ত মাখামাখি। আবার ফটফটে জল। সব রক্ত যেন ধুয়ে গেছে। শিশু দুটি খুশিতে জল খেতে থাকে। একবার রক্তের ধারা একবার জলের ধারা। প্রবল ধারায় বৃষ্টি হতে থাকে। চারিদিক জলে ভরে রয়েছে। শব্দ করে জল ছিটিয়ে গাড়ি চলে যায়। ওদের শরীরের পেছনে জল লাগে। বৃষ্টিধারায় আবার ধুয়ে যায়। শিরিশ গাছ বেয়ে জল পড়ছে। শিশু দুটি জল খেয়ে চলেছে।

১০

সারা আকাশ জুড়ে মেঘ। গুমোট ভাব। পথচারীরা সকলে ঘেমে নেয়ে চলেছে। সকলের চলার ভেতর ফুটে উঠেছে উগ্র ব্যস্ততা, অথচ মুখে চোখে বিরক্তি। অদ্ভুত অবসন্নতার ছাপ। বাস, ট্যাক্সি, মিনিবাস থেমে রয়েছে। বাস, মিনিবাস ভরে রয়েছে লোকে। দরদর করে ঘামাচ্ছে। কণ্ডাক্টর চিৎকার করছে কদমতলা কদমতলা। কণ্ডাক্টর চিৎকার করছে ধরমতল্লা ধরমতল্লা।

একটি যুবক ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলছে। ধীরে ধীরে ক্যামেরা এক ভিখিরি মহিলার দিকে ঘোরায়। মহিলার কপালে শরীরে এত গুমোটেও একফোঁটা ঘাম নেই। কঙ্কালের ওপর কালো চামড়া সেঁটে রয়েছে। পেটটি অদ্ভুত রকম শুভ্র। মাত্র দুফুট চওড়া কালো জ্যাল জ্যাল কাপড় কোমরে জড়ানো। দুটো শিশু কোলের ওপর বসে স্তনে

হাত দিয়ে ঘষছে। বুকের পাঁজর সব স্পষ্ট। যেন বীণার তারে আঙুল টেনে চলেছে। শব্দ হচ্ছে গম্ভীর নাদের। আর্তনাদের। অন্য এক যুবক টেপ অন্ করে। প্রশ্ন করে, এ শিশু দুটি কি আপনার - মহিলাটি সম্পূর্ণভাবে উদাসীন।

আমরা একটা ভিডিও ফিল্ম করছি। আপনাদের নিয়ে। মানে ফুটপাথের ভিখিরি নিয়ে—The Political consciousn ss of beggers—আমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলে ছবিটা করতে সুবিধে হবে।

মহিলাটি কিছু শুনেছে বলে মনে হয় না। ওর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। ক্যামেরাম্যান যুবকটিকে প্রশ্ন করতে বলে।

জানেন, এখন কেন্দ্রে কারা সরকার গড়েছে—

শিশু দুটি জড়োসড়ো হয়ে মহিলার শরীর জাপটে ধরে। মহিলা শিশু দুটিকে বাঁদরের বাচ্চার মত নামিয়ে রাখে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়।

আপনি ভোট দিয়েছেন—

মহিলাটি চুলগুলোর জট ছাড়ায়। ভনভন করে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। যুবকটি নাকটা একটু দূরে সরিয়ে নেয়।

জানেন এবার কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী পি ভি. নরসিংহ রাও—নেহরু পরিবারের কেউ দশম লোকসভায় নেই—পারিবারিক তন্ত্র শেষ হয়েছে—। মহিলা হেসে ওঠে—। অবশ্য বোঝা যায় না এ প্রশ্নের প্রতিক্রিয়া কিনা।

আপনি হাসছেন—

মহিলা চুপ করে। চোখ বোঁজে। হাই তোলে। শিশু দুটি কোলে উঠে আসে—। এরা কারা, আপনার সন্তান—। কোন উত্তর নেই।—আপনার বয়স—। বাচ্চা দুটিকে আবার নামিয়ে রাখে।

জানেন ইন্দিরা গান্ধী নিহত। তাঁর ছেলে রাজীব গান্ধী নিহত—এতে আপনি খুশি—। শিশু দুটি পুনরায় কোলে এসে বসে। মহিলা শিশু

দুটিকে আদর করে। একটি ছেলের কপালে চুমু খায়। অপর ছেলেটি দেখে ওর নিজের মুখ এগিয়ে দেয়। তাকেও চুমু খায়।

আপনি এখানকার ইলেকশনের রেজাল্ট জানেন—

মহিলা ছেলে দুটিকে নামিয়ে রাখে।

জ্যোতি বসু সারা ভারতে রেকর্ড করেছেন। তিনি আবার চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন / মহিলার হাসি।

আপনি রিগিং—মানে ক্লাসিক রিগিং—বৈজ্ঞানিক রিগিং কাকে বলে জানেন / হাসি।

আপনি জানেন এখানে বি.জে.পি শতকরা ১১°৪১ ভাগ ভোট পেয়েছে, আপনি কি এ ব্যাপারে চিন্তিত না আশান্বিত / হাসি।

আপনি রামমন্দির সম্পর্কে কি জানেন / হাসি।

আপনার ধর্ম কি / হাসি।

আপনি কি জানেন ভি. পি. সিংহ মণ্ডল কমিশন নিয়ে খুব আন্দোলন করেছেন। এতে কি আপনার সুবিধে হবে বলে ভাবছেন / হাসি।

আপনার কি মনে হয় এ হল আরেক সাম্প্রদায়িকতা / হাসি।

আপনি কোন সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে বেশি ভীত হিন্দু-মুসলমান না জাতপাত নিয়ে সাম্প্রদায়িকতায় / হাসি।

জিন. এন এল. এফ. বা ঝাড়খণ্ডী মুক্তি মোর্চার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী মনে করেন— / হাসি।

আপনি হাসছেন কেন / হাসি।

যে যুবকটি ভিডিও ক্যামেরা চালাচ্ছিল তার দিকে তাকিয়ে অসহায়-ভাবে বলে, একে প্রশ্ন করে কী হবে! এতো শুধু হাসছে।

ক্যামেরা থামিয়ে হেসে ওঠে। বলে, তুই যা প্রশ্ন করছিস, ও কেন ওর চৌদ্দ পুরুষও উত্তর দিতে পারবে না—

যে সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল সেও হেসে ওঠে। যে সব পথচারী কৌতুহলী

দাঁড়িয়ে পড়েছিল তারাও হেসে ওঠে। তাদের মধ্যে একজন বলে, ও কেন মশাই, আমরাও পারব না —

অন্যজন বলে, এদেশে কজন পলিটিক্যাল কনসাস।

আরেকজন বলে, দাদা চুয়াল্লিশ বছর হয়ে গেল, এখনও দারিদ্র দূর করতে পারল না—লিডারগুলো সব নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছে দেশটা ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—

ক্যামেরাম্যান বলে শোন রমেন, আমার উদ্দেশ্য হল এসব প্রশ্ন এর কী অভিব্যক্তি হয় সেটাই দেখানো—স্টার্ট—এগেন—

লোকেদের উদ্দেশ্যে, আপনারা কাইণ্ডলি একটু সরে যান—

কয়েকজন সরে যায়, অধিকাংশ নিজেদের ছবি তোলার আগ্রহে ঐ মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

রমেন ওদের হাত জোড় করে সরে যেতে বলে। কেউই সরে না। হাত দিয়ে একটু ঠেলে হাত জোড় করে বলে, দাদা একটু সরে—

রমেন মহিলার সামনে এসে টেপটা ছাড়ে।

জানেন মার্কিন আবার সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায় নেমেছে। আপনি এ ব্যাপারে কতটা ভীত। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের কপাল টিপতে থাকে।

আপনি কি জানেন ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল মার্কিনদের নিন্দা করবার ভাষা তৈরি করবার জন্য। দুচোখ কুঁচকে কিছুটা বিরক্ত প্রকাশ করবার ভঙ্গি করে মহিলা।

আপনি কি জানেন ইউরোপের প্রায় সব দেশ সমাজতান্ত্রিক কম্যুনিস্টদের থেকে মুক্তি চেয়ে গণতন্ত্র চাইছে। আপনি কি গণতন্ত্র চান। হাসি—

রাশিয়ায় গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা হচ্ছে / হাসি—

আমাদের দেশ আই. এম. এফ. থেকে ঋণ নিচ্ছে। জিনিস পত্তরের দাম বাড়ছে — / হাসি।

আপনার কী মনে হয় গ্রামের চাষিদের অবস্থা নাকি ফিরছে।
মহিলাটি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। রমেনও টেপের মাউথ পিসটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

আপনি কি আবার গ্রামে ফিরে যাবেন / হাতদুটো ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙে। ছেলে দুটি মহিলার মুখের দিকে তাকায়। মহিলা ছেলে দুটিকে টেনে নিজের কোমর ঢেকে রাখে। রমেন বলে, আপনাকে আর অল্প কয়েকটা প্রশ্ন করব—

আচ্ছা আপনার কী মনে হয় আমাদের লেখক শিল্পীরা এত বামপন্থী হয়ে উঠছে, তবু ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে সবদিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে এর কারণ কী / হাসি।

আপনি কি মনে করেন রাজনৈতিক নেতারা হল পরগাছা, ওদের ওপর আপনি কি হতাশ—

নেপথ্যে বাজতে থাকে টাক ডুম ডুমা ডুম ডুম……। বাজনাটা যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। রমেন ওপরের দিকে তাকায়। এ মেঘের আওয়াজ নয় জানে তবু তাকায়। টাক ডুম ডুমা ডুম ডুম……। ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা বন্ধ করে দেয়।

মহিলাটি কাপড় খুলে ফেলে। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ভিডিও ক্যামেরা-ম্যানের হাত থেকে ক্যামেরাটা পড়তে পড়তে মাটিতে প্রায় ঠেকলে কোনরকমে ধরে ফেলে। ক্যামেরা পায়ের কাছে রেখে উঠে দাঁড়ায়। শব্দ হতে থাকে টাক ডুম ডুমা ডুম ডুম। যেন কোন অরণ্য থেকে ছুটে আসছে বহু সহস্র বছরের আগের মানুষ।

ভিখিরি মহিলাটি টেপের ওপরে পেচ্ছাপ করে। কোন শরম নেই। কোন ভয় নেই। দেখাদেখি শিশু দুটি পেচ্ছাপ করে ক্যামেরার লেন্সে। যুবকরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ওদের ধমক দিতেও ভুলে যায়। এত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে যে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে টেপটা গলে যায়। গলে নর্দমার দিকে যাচ্ছে। ক্যামেরাটা গলে নর্দমার দিকে

যাচ্ছে। শব্দ ক্রমশ বাড়তে থাকে। রাস্তা কাঁপতে থাকে। দেবদারু গাছটা মড়মড় করে ভাঙতে থাকে। টেলিফোনের তার ছিঁড়ে যায়। ভেঙে পড়ে ল্যাম্পপোস্ট। পথচারীরা ছুটে পালায়। বাস থেকে যাত্রীরা নেমে দৌড়তে থাকে। জনশূন্য হয়ে পড়ে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যানবাহন সব। শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসে টাক ডুম ডুমা ডুমা ডুম।

সমবায় বিল্ডিং ভেঙে পড়ে। হুড়মুড় করে ভেঙে যায় ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের উঁচু বিল্ডিং। ভেঙে পড়ে স্টেট ব্যাংক। ভেঙে যায় মিউনিসিপ্যালটির বাড়িটি। কোর্ট উড়ে যায়। ভয়ে লোক ডি এম. বাংলোর দিকে ছুটতে থাকে। ভেঙে যায় সেতু। যুবক দুজন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে।

বাতাস বইতে থাকে। ঝড়। মেঘ ছুটছে এদিক ওদিক। ঝপঝপ করে জল পড়ছে। ছেলে দুটি নাচতে থাকে। আনন্দে। বহু ফুটপাথ বাসী মহিলার সামনে আসে। মহিলা নাচতে থাকে। শব্দ খুব উচ্চগ্রামে হয়। টাক ডুম ডুমা ডুমা ডুম……। শব্দ ছড়িয়ে পড়ে।

বাতাস ক্রমশ রাইটার্সের দিকে ছুটতে থাকে। ভেঙে পড়ে অফিস বাড়িগুলো। দুপদাপ দরজা জানালা বন্ধ করতে থাকে সবাই। সব ভেঙে যায়। সবাই ছুটছে।

মন্ত্রীরা বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে, আপনারা ভয় পাবেন না। প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসাথে—

সবাই ছুটতে থাকে। চিৎকার করে বলে, আপনারা নাটক করুন। ওদের সচেতন করুন, এ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত, এ প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত, এ পুঁজিবাদীদের চক্রান্ত, এ সি. আই. এ-দের চক্রান্ত, এ সাম্প্রাদায়িক শক্তির চক্রান্ত, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চক্রান্ত—আপনারা ছবি তুলুন, আপনারা উপন্যাস লিখুন, আপনাদের আমরা বঙ্কিম পুরস্কার দেব, একাডেমি পাইয়ে দেব—একি তবু আপনারা ছুটছেন

কেন, আপনাদের আমরা এত দিলাম, আমাদের বিপদের দিনে পালাচ্ছেন আপনারা বড়ো ভেসেলেটিং ক্লাশের। আমাদের হাতে নোবেল পুরস্কার থাকলে তাও দিতাম। আপনারা পালাবেন না। এটা সাময়িক সেট ব্যাক। হাজার হাজার বছর ধরে যে শোষণ চলেছে এত কম সময়ে এত সীমাবদ্ধতার ভেতর তা দূর করা যায় না। আমাদের লড়াই করতে হবে সংগ্রাম করতে হবে। জনতার জয় হবেই। জয় জনতা।

১৫ই আগস্ট

মহিলার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা নাচতে থাকে। নাচতে থাকে হাজার হাজার শীর্ণকায় নরনারী। নাচতে থাকে। তারা গাইতে থাকে। প্রবল জোরে বৃষ্টি হতে থাকে। ওরা গায়।

জল খাব মা, জল খাব
জল চাই মা, জল চাই

আমরা কংগ্রেসও জানি না, সি পি· এম ও জানি না, বি·জে·পি·ও জানি না, জনতা দলও জানি না—জল চাই মা, জল চাই –

কোরাস—জল খাব মা, জল খাব
জল চাই মা, জল চাই

আমরা গণতন্ত্র বুঝি না সমাজতন্ত্র বুঝি না সাম্যতন্ত্র জানি না

জল খাব মা, জল খাব

আমরা সাম্রাজ্যবাদও বুঝি না সাম্প্রদায়িকতাও বুঝি না বিচ্ছিন্নতাও বুঝি না

জল খাব মা, জল খাব·······

আমরা বুশও চিনি না গর্বাচভও চিনি না নরসিংহ রাও চিনি না জ্যোতি বসুও চিনি না—

জল চাই মা, জল চাই·····

আমরা মন্দিরও বুঝি না, মসজিদও বুঝি না চার্চও বুঝি না

জল খাব মা, জল খাব

আমরা হিন্দুও জানি না ইসলামও জানি না, খ্রীস্টানও জানি না বৌদ্ধও জানি না,

জল চাই মা, জল চাই

আমরা মার্কসও পড়িনি লেনিনও পড়িনি মাও দে জংও পড়িনি, জা পল সার্ত্রও পড়িনি, ফ্রয়েডও পড়িনি, গ্রামসিও পড়িনি, মিশেল ফুকোও পড়িনি,

জল খাব মা, জল খাব

আমরা অতীত জানি না ভবিষ্যৎও মানি না

জল চাই মা, জল চাই

জল খাব মা, জল খাব……

ওরা গেয়ে চলেছে। নেচে চলেছে। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। যুবক দুটির হাড় গলে গেছে। মিশে গেছে জলে। ওরা নেচে চলে। নেচে চলেছে। গান গাইছে—আমরা জল চাই মা, জল চাই… □

রাজীব সিন্‌হা

মানুষ আকাশ ছেঁড়ে দুহাত-দুপায়ে, উত্তেজিত

—তুই যখন অনেক ছোটো। আমার স্পষ্ট মনে আছে বাবুলকাকা তোদের গ্রামে পুলিশের তাড়ায় পালিয়ে এসেছিলো। আমি তখন এইটে পড়ি। গরমের ছুটিতে তোদের ওখানে গেছি। তোর বাবা, আমার বড় জ্যেঠু গম্ভীর হয়ে রান্নাঘরে এসে বসলেন। তারপর জ্যেঠুমাকে বললেন, 'বাবুল এসেছে। জানি না কোথা থেকে। রাতে থাকবে। খাবে।' আমরা তিন-চার ভাইবোন তখন খেতে বসেছি। গ্রাম বলে তোদের ওখানে রাত আটটার মধ্যেই প্রায় সবার বাড়িতে খাওয়া হয়ে যেতো। হয়তো এখনো হয়। তুই তখন জ্যেঠুমার কোলে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ছিলিস। উনি জোর ক'রে ক'রে তোর মুখে ভাত ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন। সত্যি কথা বল্ অন্তু, সেদিনগুলো কত ভালো ছিলো। বছরে কমপক্ষে একবার সে গরমেই হোক বা শীতেই হোক আমরা সব খুড়তুতো ভাইবোনেরা তোদের ওখানে যেতাম। অন্তত একমাস একসাথে থাকতাম। ঘুড়ি ওড়াতাম। লাট্টু ঘোরাতাম। গুলি, ডাংগুলি খেলতাম। তোর কি মনে আছে অন্তু, একদিন মিশ্রদের বাড়ির সেই বিরাট লিচুবাগানে লিচু পাড়তে গিয়ে তুই আর আমি, হ্যাঁ, সেদিন একমাত্র তুই আর আমি এ দুজনই ছিলাম, মনারা পুরনো ভাঙা মসজিদটাতে লুকোচুরি খেলছিলো, তুই আর আমি সেখান থেকে পালিয়ে মিশ্রদের বাগানে ঢুকেছিলাম লিচু পাড়তে, তোর মনে পড়ছে, অন্তু, সেইদিন, অই অতটুকু তুই, হ্যাঁ, তুই-ই প্রথম দেখেছিলিস, লিচু-গাছটার নিচের দিকের ডালে একটা ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি ঝুলছিলো?

মনে পড়ছে অন্তু? তারপর তুই আমি দুই খুদে গোয়েন্দা খুড়তুতো ভাই ছোটো ছোটো ইট ছুঁড়ে মাটিতে নামিয়েছিলাম পুঁটলিটা। সত্যি বলছি রে অন্তু, এই ছাখ, এতোগুলো বছর পরেও আজ আমার গায়ের লোম আবার খাড়া হয়ে গেলো ভয়ে। পিঁপড়ে ধরে গেছিলো। বোধহয় অল্প অল্প গন্ধও হয়েছিলো। ভয়ে তুই আমার হাত আঁকড়ে ধরেছিলিস। সেদিন ঐ মাঝহপুরে মিশ্রদের বাগানে লিচুগাছতলায় কাপড়ের পুঁটলিতে জড়ানো রক্তমাখা একটা মাসকয়েকের মৃত ভ্রূণ পেয়েছিলাম লিচু পাড়তে গিয়ে। কি-রে অন্তু? মনে পড়ছে?

—ছাখ্ ছোড়দা। অতোশতো বুঝি না। তুই খুব ভালো ক'রেই জানিস বয়সে ফারাক থাকলেও ছোটোবেলা থেকেই তোর সাথে আমার দোস্তি বেশি অন্যদের চেয়ে। তাই তুই শালা পুরনো দিনের— ছোটোবেলাকার একটার পর একটা ঘটনা মনে করিয়ে আমাকে উইক্ ক'রে দিচ্ছিস। কই আমার প্রশ্নের তো জবাব তুই এখনো দিলি না? বল্, মানুষ আত্মহত্যা করে কেনো?

—অন্তু, তুইতো কখনো এমনি ছিলিস না। এরকম অদ্ভুত গলায় কথা বলছিস কেনো রে? তুই বল্ কি হয়েছে তোর? এতোদিন ধ'রে তুই কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলিস? আর আজ এইরকম সব অদ্ভুত প্রশ্নই বা কেনো করছিস আমাকে? কিরে, চুপ ক'রে থাকিস না। বল্। অন্তু, ছাখ্ আবার বাবুলকাকার কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে। তোর মনে থাকারই কথা এটা। তুই তখন ফোরে পড়িস। আমি সেবার এইটে উঠলাম। একটু আগেই তোকে বলছিলাম যে, গরমের ছুটিতে তোদের ওখানে গেলাম। একদিন সন্ধেতে বাবুল-কাকা হঠাৎ তোদের বাড়িতে হাজির। অনেক পরে শুনেছি সেদিন বাবুলকাকা পুলিশের তাড়া খেয়েই পালিয়ে এসেছিলো। বড় জেঠু গম্ভীর হয়ে আমাদের বাবুলকাকার সাথে ছাখা করতে বারণ করে-ছিলেন। কিন্তু আমার আর তোর সাথে বাবুলকাকার বন্ধুত্ব মনা-

রাজুদের থেকে অনেক বেশি ছিলো। বাবুলকাকা আমাদের ভালোও বাসতেন বেশি। আমরা চকোলেট টফির আবদার একদমই করতাম না, কারণ আমরা জানতাম যখনি বাবুলকাকা আসবেন তখনি আমাদের জন্য সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়া বই নিয়ে আসবেন। সেবারও ঐ বইয়ের লোভেই রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে পা টিপে টিপে আমরা দুজন বাবুলকাকার কাছে গেলাম। সেবার বাবুলকাকার যা চেহারা দেখেছিলাম, আজো সেই মুখ মনে পড়ে। এ লোকটা কে? এটা তো আমাদের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলা সেই বাবুলকাকা নয়। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। উস্কোখুস্কো চুল। নোংরা জামা-প্যান্ট। চোখের কোণে কালি। বাবুলকাকা প্রচণ্ড কালো হয়ে গেছে। কিন্তু একটুও বদলান নি। সেই অদ্ভুত হাসি মুখে নিয়ে ডাকলেন, 'আয় আয়। কিরে তোরা দুজন যে আমার সাথে দ্যাখা করতে এলি, বড়দা মানা করেননি?' আমরা অপরাধীর মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে। বাবুলকাকা প্রসঙ্গ বদলে বললেন, 'এবার কিন্তু দুজনকে দুটো বই দিতে পারবো না বুঝলি। একটাই বই এনেছি। প্রথমে তুই পড়বি। তারপর অন্তুকে গল্প বলবি।' তোর মনে পড়ছে অন্তু? সেই প্রথম অত্যন্ত রেগে গিয়ে আমি তোকে মেরেছিলাম। অনেকগুলো কিল-চড়-ঘুঁষি। বাবুলকাকা আমাদের দিয়েছিলো 'চীনদেশের রূপকথা' বইটা। তুই বইটার পাতায় পাতায় ছবি এঁকে বইটা নোংরা ক'রে দিয়েছিলিস। সেই রাগে আমি তোকে মেরেছিলাম। পরে তোর যখন জ্বর হলো, তখন কষ্টে আমিও ভাত খাইনি দেখে জ্যেঠুমা বলেছিলেন, 'তোরা মায়ের পেটের ভাই না হয়েও তোদের দুজনের এতো মিল? বড়ো হয়ে ঠিক এরকম থাকবি তো তোরা?'

—হ্যাঁ, এরপর তুই বলবি যে একদিন পরে বাবুলকাকাকে বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায় না। পরের দিন বিকেলে সদর থেকে পুলিশ আসে বাবুলকাকার খোঁজে। বাবাকে যে পুলিশ অফিসার চোখ

রাঙিয়ে কথা বলেছিলো, সত্যি বলছি ছোড়দা, তার মুখ আমি এখনো মনে রেখেছি—বাগে পেলেই ব্যাটাকে দেবো শেষ ক'রে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ অন্তু বল্ বল্। তারপরে বলে যা কিভাবে তার পরেরদিন সকালে নদীর ধারে ছিপ ফেলতে গিয়ে তুই আর আমি বাবুলকাকার জামা দেখতে পাই। বল্ বল্ অন্তু।

—কিন্তু আমার প্রশ্নের এখনো উত্তর দিলি না ছোড়দা। বললি না তো, মানুষ কেনো, কিজন্য আত্মহত্যা করে?

—উঃ। আবার ঐ একই প্রশ্ন! কিরে অন্তু তুই কি পাগল হয়ে গেছিস নাকি? বারবার একই প্রশ্ন করছিস। এরপর হয় তুই পাগল হয়ে যাবি—নয়তো আমি পাগল হয়ে যাবো।

—কেনো, তুই কি বলতে চাস যারা আত্মহত্যা করে তারা সবাই পাগল? তাহলে আমাদের বাবুলকাকাও পাগল?

—মিথ্যে কথা। বাবুলকাকা আত্মহত্যা করেনি। অন্তু, ওটা মিথ্যে কথা বলা হয়েছিলো। আমি এখনো জোর গলায় বলতে পারি বাবুলকাকাকে পুলিশই গুলি ক'রে মেরেছিলো—বড়ো জ্যেঠুর, তোর বাবার পাতা ফাঁদ ব্যবহার ক'রে।

—কী প্রমান আছে ছোড়দা তোর কাছে? তুই যে এ কথা বলছিস তার কি কোনো ভিত্তি আছে? তাহলে বাবুলকাকা মারা যাবার মাস ছয়েকের মধ্যেই বাবা কেনো ঠাকুরঘরে মায়ের গরদ গলায় জড়িয়ে ফাঁসিতে লটকালো?

—তুই এতগুলো বছর পর আবার কেনো ফিরে এসেছিস? কেনো এসেছিস? সত্যি কথা বল্ অন্তু, কী তোর উদ্দেশ্য?

—এ নিয়ে পঞ্চমবার বলছি—আবারো বলছি ছোড়দা, তুই আমার একটা ছোট্ট কথার উত্তর দে। উত্তর পেলেই আমি চ'লে যাবো—মানুষ কেনো আত্মহত্যা করে?

—উঃ! বেরিয়ে যা তুই এখান থেকে। বেরিয়ে যা অন্তু। ভালো

হবে না বলছি। আমার মাথার ভেতর দপ্ দপ্ করছে। মনে হচ্ছে গোটা মাথাটাই একটা ভিসুভিয়াস। বারো বছর পর কি আবার তোকে মারবো অন্তু? কিরে কী বলিস্? সত্যি বলছি—তুই পালিয়ে যা আমার দুচোখের সামনে থেকে—আর জ্বালাস না আমায় ভাইরে—আর জ্বালাস না।···অন্তু, একটা বিড়ি আছে রে?

—ছোড়দা, কামু পড়েছিস্? আউট সাইডার? কিসের তুই এতো আদর্শের বুলি কপ্চাস? কমিটমেণ্টের কথা বলিস? আমি যদি বলি সেদিন রাত্রে তুই বাবা ও মিস্টার সান্যাল নামক পুলিশ অফিসারটির সমস্ত কথা লুকিয়ে শুনেছিলিস, অস্বীকার করতে পারবি? কিন্তু, তারপরও তুই বাবুলকাকাকে কিছুই জানাস নি! আরে আমি না হয় ছোটো ছিলাম, আমাকে তুই বলতে চাসনি। যা ভেবেছিলিস আমি কিছুই বুঝতে পারবো না। কিন্তু তুই তো এইটে পড়তিস তখন। যথেষ্ট বড়ো। তুই তো বাবুলকাকাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে পারতিস। কিরে, চুপ ক'রে আছিস কেনো? খুব ভালো লাগতো তখন বাবুলকাকার হেঁড়ে গলায় 'ইণ্টারন্যাশনাল' শুনতে? ভাঙা মসজিদে সুর ক'রে গাইতে—'সনাতন জীর্ণ কু-আচার / চূর্ণ করি জাগো জনগণ?' আমার জোতদার বাপ না হয় পুলিশের ভয়েই পুলিশের সাথে যোগ-সাজস করে। বাবুলকাকাকে খুন করতে সাহায্য ক'রে রটিয়ে দেয় –বাবুলকাকা পাগল ছিলো—শেষ রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরে। আচ্ছা ছোড়দা, নদীতে ডুব দিয়ে মরলে বুকের বাঁদিকে বুলেটের ক্ষত থাকে নাকি রে? আমার জোতদার বাবা অনেক আগেই নিজের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই ক'রে গেছে ঠাকুরঘরে মায়ের গরদে গলায় ফাঁস এঁটে। কিন্তু তুই, তুই কি করলি রে ছোড়দা? তুই যদি সেদিন রাতে বাবুলকাকাকে সব ঘটনা খুলে বলতিস তাহলে কি দু'টো মানুষ অর্থাৎ আমার বাবা ও বাবুলকাকা আজো বেঁচে থাকতো না?

—অন্তু। ভাই আমার। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে ছোটোবেলা থেকেই আমি কিরকম ভীতু। তোদের বাড়িতে কাজ করতো কল্পনা। দুপুর হলেই তার সদ্য উঁচু হওয়া বুক দুটো আমাদের পিষতে বলতো। দেখতাম তুই কিরকম নির্দ্বিধায় তোর আট নয় বছরের হাত দিয়ে ওর দুই বুক চট্‌কে দিতিস। আর বারো-তেরো বছরের আমি কাঁপা-কাঁপা হাতেও ওগুলো ঠিকমতো স্পর্শ করতে পারতাম না।

—দ্যাখ্‌। বাজে যুক্তি দিবি না। কল্পনার বুকে হাত দিতে আর দুজন নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু ঠেকাতে সমান সাহসের প্রয়োজন হয় না। আমি জানি তুই চিরকালই এ রকম শামুক প্রকৃতির। শালা সব ঘটনা ঘটাবি -আর যেই দেখবি সামনে বিপদ অমনি খোলার ভেতর নিজেকে গুটিয়ে নিবি

—দ্যাখ্‌, অনেক সহ্য করেছি। অনেক বাজে কথা বলছিস তুই আজ। আমার কিন্তু রাগ বেড়ে যাচ্ছে। এরপর হাতাহাতি হয়ে যাবে। তুই তার আগেই চুপ কর। এসব আজে-বাজে কথা রাখ্‌। তারপর বল্‌ এতোদিন কোথায় ছিলিস? আর আজ এতগুলো বছর পর হঠাৎ ক'রে উদয়ই বা হলি কেনো?

—একটাই কথা জানতে, তোর মতো একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীর কাছে—মানুষ আত্মহত্যা কেনো করে?

—উঃ! অসহ্য! আবার ঐ একই কথা। আই সে গেট আউট! বেরিয়ে যা অন্তু! আমার দু চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

—ছোড়দা, বেরিয়ে আমি যাবোই। তোর কাছে আমি থাকতে আসিনি। দেখি তোর তত্ত্ব কী কথা বলছে? এতবড়ো একজন সমাজবিজ্ঞানী সমাজের অন্যতম গৃহপালিত প্রাণী মানুষ বিষয়ে কী ভাবছেন? মানুষ আত্মহত্যা কি জন্য করে এ বিষয়ে তাঁর মত কী—আমি শুধু এটুকুই জানতে এসেছি।

—শুনবিই তাহলে? তাহলে শোন্‌। আসলে বাবুলকাকা, বড়ো

জ্যেঠু বা রমা এরা কেউই আত্মহত্যা করেনি—এরা কেউই আত্মহত্যা করে না।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-বল্, রমার কথাও বল্। বল্ যে কিভাবে রমা তোর বাচ্চা পেটে নিয়ে একগাদা ঘুমের বড়ি খেয়ে মরেছিলো? বল্ সে কথাও বল্, কেনো রমা আত্মহত্যা করেছিলো পরীক্ষার ফলাফলের ওপর সুইসাইডিয়াল নোট লিখে গিয়ে?

—অন্তু। তোর গলার স্বর কেনো কাঁপছে রে? নাকি আমিই ভুল শুনছি? তুই কি বলতে চাইছিস যে এই তিনজনকে আমিই খুন করেছি? কিরে চুপ ক'রে থাকবি না। সত্যি কথা বল্।···দ্যাখ্ অন্তু। আসলে কি জানিস পৃথিবীতে কোনো মানুষই আত্মহত্যা করে না। মানুষের আত্মা হনন করা হয়। হত্যা করি আমরা। আমরা সবাই। মানুষের পরিবার। পরিজন। পরিবেশ, পরিস্থিতি। মানুষের মানসিক অবস্থা। তার ভারসাম্য। আর এই ভারসাম্য হারিয়ে গেলে একজন মানুষ আত্মহত্যা না করবে তো কী করবে? দু-হাত-পা মাটিতে নামিয়ে মাঠে চরতে চরতে ঘাস খেয়ে বেড়াবে? কি রে? □

দেবেশ কান্তি চক্রবর্তী

প্রেমের গল্প

জীবনের মধ্যবিন্দু থেকে সটান মোড় ঘুরেছি শৈশবের দিকে। এখন বিনা কারণে সময় নষ্ট করতে আফসোস হয় না। যে লেবেঞ্চুস একদিন বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিস্বাদ মনে হতো, একটু একটু করে জিভে তারও স্বাদ ফিরে আসছে। বালকোচিত হুল্লোড়ে সহসা নিজেকে হারিয়ে ফেলি। নব জীবনের মুগ্ধতা চোখে নিয়ে প্রতিমা গড়তে দেখি। রূপে রঙে ক্রমশ জীবন্ত করে গড়ে তোলার শৈলী আমার কাছে অভিনব মনে হয়। শিল্পশালার দ্বারের কাছে জল চৌকিতে তির্যক হয়ে বসে শিল্প কর্ম দেখি। লক্ষ্য করি শিল্পীর অভিনিবেশ। বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে শিল্পী যখন প্রতিমার ভ্রূ যুগল কিংবা আলগা টানে চোখের পাতা আঁকে আমার নিশ্বাস নিতে ভয় করে, আঁকার শেষে স্বস্তির শ্বাস ফেলি।

আমি যে তবে সব সময়ই নীরব থাকি তা নয়। প্রতিমার গায়ে ঢালা রঙের কাজ চলে কিংবা মূর্তি গড়ার প্রথম অধ্যায় তখন গল্প চলে আমাদের। প্রমীলা যদি থাকে সে আমাকে মুখ খোলারই অবসর দেয় না। দড়ি যে রকম লম্বা হয় পাটের গুছির মতো, গল্পের খেই ধরতে ওর জুড়ি নেই। মাঝে মাঝে থামে আর আমার দিকে সোজাসুজি দৃষ্টি হেনে কবুল নেয়, আমি কি মিছে বললুম ?

এটা প্রমীলার মুদ্রাদোষ। আসলে সে হয়তো নিজে বুঝতে পারে না তার কথা লাইনে চলছে না ভুল-চুক হচ্ছে কিছু।

তা যতই কথা বলুক কারিগরিতে হাতটি সাফ। সত্যি কথা কি প্রতিমার গায়ে যখন ঝিলিক থাকে না তখন চোখ দুটো প্রমীলাকেই

টানে। সেও জানে ঘাড় ফেরালেই আমার চোখ দুটো তার দিকেই ফেরানো দেখবে। অর্থাৎ তার গল্প শুনতেই তো আমার আসা। কোনদিন ওদের শিল্পশালায় পিদিম জ্বললে তবে উঠি। প্রমীলা তখন বলেও না যে আরও বসুন। ঘরে ফিরি।

ঢিমে তেতালা চলন বলন দেখে আমি এর নাম দিয়েছি আয়েসী গ্রাম। গ্রামের গরীব থেকে ধনী সবাই তরিবত মেজাজে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। একটা মিহি মৃদুল ছন্দ আছে। হতে পারে মন্দাক্রান্তা—এরা কেউই জগত জোড়া যে ঘোড় দৌড় শুরু হয়েছে তার খোঁজ রাখে না।

আমি আয়েসী মানুষ, ঘোড় দৌড়ে হাঁপিয়ে উঠি—অনেক খুঁজে পেতে ঠেক নিয়েছি আয়েসী গ্রামে। বাকি জীবন আয়েস করেই কাটিয়ে দেব।

বাংলা বিহার সীমান্তে এই গ্রাম। আমি বাংলা সরকারের পোষ্য। বাস করি বিহারে। ঘরে ফেরার সময় নদীর পাড়ে গাছ গাছালির মাথায় পাখিরা কলরব করে আর গাছের গুঁড়িতে ক্রমশ অন্ধকার ঘন হয়ে আসে।

আমি যে ঘরটাতে থাকি তার সামনেই একটা শ্রীহীন জিয়ল গাছ। ওটি গৃহস্বামীর সীমানার সামান্য খুঁটি থেকে অতিক্রান্ত হয়েছে। দুই ফসলী জমির মতো বছরে দুবার শুঁয়োপোকা হয়। দিবসে যারা আমার শয্যাসঙ্গী হতে চায় তাদের হত্যা করতঃ কবরস্থ করি। যারা রাতের সঙ্গী হয়—বড় বিষম প্রণয় ঘটে। রাতে খুব ভাল চোখেও দেখিনা। পরদিন দুঃখ নিবেদন করলে কেউ কেউ উসকে দেয় মালিককে দিয়ে গাছটি কাটানোর জন্য। আমি বৃথা অশান্তি এড়াতে চেপে যাই। তা ছাড়া একটা ব্যক্তিগত কথা বিসদৃশ না হলে বলি, দুটো ডালের ফাঁকে চাঁদ উঠলে ভারি ভালো দেখায়। মনে হয় বাদামী ফ্রেমের মধ্যে চাঁদটাকে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন শুঁয়োর অত্যাচার মনে থাকে না।

তবু ব্রীজ আমাকে মাঝে মাঝেই বলে এ ঘর ছেড়ে দিয়ে আমাদের ও দিকটায় চলুন বিভূতিবাবু। অন্তত কোঠাঘর একখানা পাবেন আর আপনারা শহুরে মানুষ অন্তত মাঠঘাটের চেয়ে বাথরুম ইত্যাদির ব্যবস্থা তো করে দিতে পারবো।

আমি স্পষ্ট ভাষায় না করি না, ব্রীজকে দুঃখ দিয়ে কি লাভ?

বলি,—যখন যাবো তার আগেই তোমাকে জানাবো।

ব্রীজ হাল ছেড়ে দেয়—আপনি একা মানুষ আপনার এত দ্বিধা। নাও মুশকিল! ওকে কি করে আমার নিজস্ব ব্যাপারগুলি বোঝাবো! এখানে আছি বলেই আসা যাওয়ার পথে শিল্পশালা দেখতে পাই। প্রমীলাকে দেখি আর প্রমীলা পরিচয় করিয়ে দিয়েছে তার এক নানাজির সাথে। আমার ঘরের কাছেই তার ঘর—উনি একজন মস্ত গুণী মানুষ। তিনি অনুবাদ করেন। একদিন শুনি দেবদাসের হিন্দি করছেন। ভারি আনন্দিত হয়ে গেলাম। উনি যত্ন করে বসালেন। কিন্তু বস্তুটি দেখালেন না। তার ভয়টি কোথায় বুঝতে পারি।

বাঙালি হিসেবে অনুবাদের কিঞ্চিত বাহবা চাইতে পারি তার অংশ দিতে তিনি নারাজ। বেশ তবে পরেই শুনবো। পণ্ডিতজির স্ত্রী আমাকে দুধে জ্বাল দিয়ে হালুয়া খাইয়ে দিলেন। অপত্য স্নেহে বললেন—তুই বেটা মাঝে মাঝে এলেই পারিস। আমি কিছু বলার আগেই পণ্ডিতজি টিকি নাচিয়ে বলে উঠলেন—উঁহুঁ! আমার অনুবাদ শেষ হতে আরও মাস খানিক লাগবে তুমি তারপর আসবে। তার আগে নয়। হেন কথায় আমি অপমানিত বোধ না করে হেসে উঠে পড়ি।

বাইরে এসে দেখি দুটি ফুটফুটে কিশোর কিশোরী লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে সরে দাঁড়ালো। বুঝতে পারলাম এরা হচ্ছে পণ্ডিতজির প্রথম শ্রোতা। বিষয় বুদ্ধির কুটকচালে যায় নি এরকম দুটি আনকোরা মনের উপর অনুদিত গল্পরীতির কী প্রভাব তা

প্রত্যক্ষ করতে করতে তার কাজ এগিয়ে চলেছে এ কথা জানিয়েছিলেন আগেই। এ রকম মহৎ চেষ্টাকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারি না।

চলে আসি প্রমীলার কাছে। প্রমীলার শিল্পে ওরকম চর্যারীতির গুমর নেই। সে আমাকে বিনা দ্বিধায় নিচ্ছে। নিরুত্তাপে ছেড়ে দিচ্ছে। তবে যেহেতু আদর বুঝি, মনের কাছে স্পষ্ট হয় সে আমাকে মন্দ নেয় না। অন্তত তার বিশ্বস্ত বিমুগ্ধ শ্রোতা হিসেবে।

পণ্ডিতজির ঘর থেকে সোজা ওর কাছেই গেলাম। ও ছিল না। শিল্পশালার উজ্জ্বলতা অর্দ্ধেক কমিয়ে দিয়ে তার এই অনুপস্থিতি, রঙ কাদায় বিচিত্র বেঞ্চিটা খালি পড়ে আছে। ছোট বড় মালায় বিচিত্র গোলা রঙ। বেশির ভাগই শুকিয়ে খটখটে।

কি জানি কেন শিল্পশালায় তত আনন্দ আছে বলে মনে হল না। কিন্তু আমি চতুর মানুষ এই মুহূর্তে ফিরে গেলে অন্য শিল্পীরা আন্ কথা ভাবতে পারে তাই আমি পূর্ব নির্দিষ্ট জল চৌকিতে বসলাম।

প্রমীলার জগদ্ধাত্রী মুণ্ডুহীন এখনও সিংহপৃষ্ঠে আসীন। সিংহ ছাল চামড়া এবং কেশরহীন। আমি মুখ ফিরিয়ে অন্য শিল্পীদের অগ্রগতির দিকে নিবিষ্ট। একটু কেশে উপস্থিত হলো নিধিরাম। কুচকুচে হুঁকোটির মাথায় জ্বলন্ত কলকেটি বসিয়ে মেজাজে দুটান মেরে উবু হয়ে বসলো আমার পাশে।

আয়েসী গ্রামের সাবেক মানুষ। শিল্পশালার কাছেই ঘর। তবে সে শিল্পী নয় মাংস বিক্রেতা। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মৃদু গলায় বললো,—আপনি রসিকজন, কাদা মাটির উপরেই রস খুঁজে পান—হেঁ হেঁ হেঁ ভুল বললাম কি ?

আ মর জ্বালা ! এও দেখছি সাক্ষী মেনে কথা কয়।

আয়েসী গ্রামের ধরনটাই বুঝি এরকম।

মনে যাই থাক বিগলিত হয়ে বললাম,—ভাল লাগে আসি এই আর কি ? নিধিরাম আরও বিনয়ে বলে,—বেশ বেশ সবার চক্ষু তো আর

সমান নয়। কেউ তো শুনি কণিকা জলে সাগরের ঢেউ গুণতে পান।

নিধিরামের কথা বেশ সাপের মত বাঁকে বাঁকে চলে। এবং সে নিজের ইচ্ছে মতোই আপনি পথে যায়। আমি যেতে দিই। কত রকমের না মানুষ! আমাকেই ওরা 'চিড়িয়া' ভাবে কিনা জানে কে?

নিধিরামের গলা আরও বুজে আসে। ব্যাঙটাকে প্রায় কব্জা করার মতো বসে --ধর্মের গা জড়িয়ে অধর্ম বেয়ে উঠলে মনে কি শান্তি আসে বলুন, আমি কি ভুল বললাম?

আমি ইশারায় বোঝাই তুমি বড় হক কথা বলেছ। সে মোদ্দা কথায় আসে—এই যে প্রমীলাকে দেখছেন এ কি যে সে, দূরপাল্লায় চক্কর কাটা চিড়িয়া শেষে কপাল ভেঙে······।

আমি আতঙ্কে বলি,—আহা থামুন, একদম এসব কথা না, অন্য কথা বলুন। নিধিরাম কথা না পেয়ে হুঁকোয় জোরে টান দেয়। ওর চামড়ায় খাঁজ কাটা চোখের কোণগুলো চতুরতায় হাসে।

ফেরার সময় অজান্তেই বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তবে প্রমীলার বিয়ে হয়েছিল? নাকি ও খারাপ মেয়ে। একা একা মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে জল্পনা করি সহসা দ্বন্দ্ব ঘুচে যাক তা আমি চাই না।

এই আয়েসী গ্রামের মন্দাক্রান্তার ছন্দ কাটে কুমার সাহেব এলে। শহুরে ঘোড় দৌড়ের ছোঁয়া আসে। তড়বড়িয়ে লোক দৌড়ায়। কুমার সাহেব মস্ত লোক। শিল্পশালা থেকে শুরু করে পুরো বস্তিটাই ওঁদের। অর্থাৎ আমি যেখানে থাকি, পণ্ডিতজির ঘর যেখানে—সমস্তটাই কুমারের তালুক এখনও সেই ঠাকুরালী। কী একটা চুক্তিতে সবাই থাকে। ছিল নাকি ওরকম আরও এলাকা তবে ওদের হটিয়ে ভদ্রলোক বসে যাচ্ছে।

তাও পুরোনো পাড়াটা ছোট নয়।

কুমার সাহেব বছরে দু'তিনবার আসে। কোন বছর নির্বাচন পড়লে

আসা হয় ঘন ঘন। প্রজাদের ধরে ধরে উপদেশ দিয়ে যায় প্রজারা তা ভয়ে ভয়ে পালন করে।

কুমার সাহেব দেখতেও নাকি জবরদস্ত। লম্বা ফর্সা পাতলা চেহারা, টানা নাক তীক্ষ্ণ চোখ। পিঠে বন্দুক বেঁধে মোটর সাইকেলে দুর্দান্ত জোরে ছুটে বেড়ায়। দ্বারভাঙার রাজা মশাইদের পাতা লতার আত্মীয়। যাই হোক আমি কোনদিন দেখা করিনি। লোকটার মুখ নাকি অশ্রাব্য। ওই গাল মন্দকে বড় ভয় আমার।

হঠাৎ একদিন মন্দাক্রান্তার তাল কাটে।

চঞ্চলতা দেখে ভাবি কুমার সাহেব বোধ হয় এলেন।

একজন বলল,—না মশায় অন্য ঘটনা,—মোতি শর্মা বলে ছেলেটি, গৌরী পাশোয়ান বলে মেয়েটির খুব করে হাত মুচড়ে দিয়েছে।

—কেন কেন? অল্পেতেই আমার বুক ধড়ফড় করে।

কেনর উত্তর কেউ দিতে পারে না।

মোতি আর গৌরী নাকি অনেকটা লায়লা মজনুর মতো। মেরে বকে সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। ওরা সব সময়ই পণ্ডিতজির বাড়ি পড়ে থাকে।

আমার চকিতে দুটি সুশ্রী কিশোর কিশোরীর কথা মনে পড়ে যায়। মনের ভেতর কৌতূহলটাও দানা বাঁধে।

প্রমীলার কাছে বসি। সে ঘন ঘন বাঁকা চোখের দৃষ্টি হানে আর গল্প বলে—নানাজি এক কাহানী লিখেছেন। প্রেমকাহানী। দিলের ভেতর চিরদিনের আসন পেতে বসতে দিলবালা তার মেহবুবাকে কষ্ট দিচ্ছে। আধলা মেরে ফাটিয়ে দিচ্ছে কপাল, হাত ভেঙে দিচ্ছে ঠ্যাং ভেঙে দিচ্ছে····।

আমি চমকে উঠি—সর্বনাশ! পণ্ডিতজি নির্ঘাৎ দেবদাস অনুবাদের কিছু উল্টোপাল্টা করে ফেলেছেন। অভিমান করে বসে থাকবো না ছুটে গিয়ে সাবধান করবো! গল্পটা মুখে মুখে যদি চাউর হয়ে যায় উদ্বুদ্ধ

ছেলেমেয়েরা ভয়ানক খুনোখুনি শুরু করে দেবে। আর ইটের ঘা খেয়ে পার্বতী যদি না বাঁচে তাহলে কাহানী বাঁচবে কেমন করে?

আমাকে চপল দেখে প্রমীলা বলে,—বস বস। এ তোমাদের কোন বাঙালি বামুনের অমরকাহানী, নানাজি ওটা হিন্দি করছেন। কি বল ভারি আচানক প্রেম, নয়?

আমি কথা না বলে বসে থাকি। বাঙালির গর্বে যে বুকটা ফুলে ওঠে সেই বুকটাই আবার ধড়ফড় করে নব দেবদাসের তুমদাড়াক্কা ভূমিকা দেখে।

দিন ফুরোয়। ধীরে ধীরে আয়েসী গ্রামেও লোকের ভিড় ও ব্যস্ততা বাড়ে। মন্দাক্রান্তা ঘন ঘন কেটে যায়।

বাইক ছুটিয়ে সপ্তাহে দুদিন আসে কুমার সাহেব। গুজব শুনছি লোহার পাড়াটা উঠে যাচ্ছে। ওরা নোংরা অসভ্য এই অজুহাতে কুমার সাহেব ওদের হটিয়ে দিচ্ছে আরও দূর গ্রামে। আমি ওদের বুড়ো শিবচরণকে বলি,—ঠেলা খেয়েই নড়ে যাচ্ছো! শুনলাম পাড়া ভেঙে চলে যাবে?

সে বিপন্ন মুখে মাথা দোলায়,—হ্যাঁ বাবু। চারদিকে ভদ্দরলোক এসে যাচ্ছে। আমরা আরও গ্রামে চলে যাবো। একটু মাঠ ঘাট ঝোপ জঙ্গল না হলে আমাদের পোষায়?

নাও ঠেলা! একে বোঝাবে কে? শিউচরণের ছেলে নির্মলকে নিয়ে পড়ি।—ওহে, একদিন তো কোনখানেই ফাঁকা মাঠ আর ঝোপ জঙ্গল থাকবে না। তখন যাবে কোথায়? এখন যেসব কারণে কুমার-সাহেব উঠিয়ে দিচ্ছে সেগুলো শুধরে ফেলো তবে তো ল্যাঠা চুকে যায়।

নির্মলের মনে কথাটা গেঁথে যায়। মাথা চুলকে বলে, হ্যাঁ তাইতো ঠিক। শেষে তবে আমরা যাবো কোথায়?

আমি উৎসাহিত হয়ে বলি,—জাতের সবাইকে বোঝাও। এ জায়গা

ছেড়ে কোথাও যেও না, এভাবে স্রোতের মুখে ভাসতে থাকলে তোমাদের জাতটা কবে নিজের শেকড় কামড়ে দাঁড়াবে বলতো ?

নির্মল আমাকে একটা সেলাম দিয়ে চোয়াল শক্ত করে চলে যায়। দু'চারদিনের মধ্যেই লোহার পল্লীতে আমার আর্জি সমাদর হয়।

আমি শিল্পশালায় এলে প্রমীলা কথা না বলে আমাকে শুধু দেখে। ওর চোখে নিবিড় প্রশংসা। আমার বুক দুরু দুরু করে। ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে প্রমীলার একটা হাত মুচড়ে দিই।

পণ্ডিতজির সাথে দেখা করবো বলে পা বাড়িয়েছি। বাসক ঝোপের ধারে থামতে হলো। রুদ্ধশ্বাসে দেখি মোতি গৌরীর হাতের প্লাস্টারে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ভ্যাবলার মতো কাঁদছে দুজনেই। বিশ্বসংসারে আর যেন কিছু নেই। আমি চোরের মতোই ফিরে যাই। যে কথা জানতে পণ্ডিতজির কাছে আসা তার জবাবটাতো এই। এবং জবাব পাবার পর থেকে প্রমীলার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। ওকে নতুন করে আবিষ্কারের জন্য ছুতোনাতায় ওর কাছে যাই।

কি জানি কেন সেও ছুতোনাতায় আমার সঙ্গে দেখা করে। সহসা আমার মনে হয় এই লোহার বস্তিটা টিঁকিয়ে রাখতেই হবে। আর কারুও জন্য না হোক আমার নিজের জন্য। প্রমীলা যে এখানে থাকে।

আমার আয়েসী প্রাণে অস্থির অস্থির লাগে ওঠে। এখন আমার আলেস ভাল লাগে না। অকারণ সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না। সারাক্ষণ বুকের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ।

একদিন পরিষ্কার ধুতি জামা পরে, কাঁধে উত্তরীয় নিয়ে রওনা হবার জোড়জোড় করি। এমন সময় প্রমীলা ছুটে আসে।

—তুমি নাকি কুমার সায়েবের সাথে কথা বলতে যাচ্ছো ?

—হ্যাঁ যাচ্ছি। লোহার পল্লীটা উঠবে না। এখানে থেকেই সবাই

আধুনিক আদপ কায়দা শিখবে। সে জন্যই একটু ওকালতি করবো—অবশ্য দরকার হলে মারামারি করবো।

প্রমীলা ওর বড় পুঁটি মাছের মতো চোখ মৌরলা মাছের মতো সরু করে কঠিন দৃষ্টি হানে। আমি যেন অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা না করি তাই গম্ভীর গলায় বলে,—তুমি জানো কুমার সাহেবের পিঠে সব সময় গুলিভরা বন্দুক থাকে এবং তার লাইসেন্স আছে।

আমি ঠাট্টা করে বলি,—লাইসেন্স মানে, মানুষ মারার লাইসেন্স নাকি ?

—হেসো না। প্রমীলার চোখ ছল ছল করে।

আমার বুকের ভেতরটায় আশ্চর্য ছটফটানি। মনে হয় আমি যুবক হচ্ছি, দেবদাস হচ্ছি। প্রমীলাকে প্রহার করতে ইচ্ছা করে (বুঝতে পারি না পণ্ডিতজির অনুবাদের গুণ কিনা)।

ওকে কাছে ডাকি। এতদিন সে আমার বুকের মধ্যে যতগুলি তুলির টান দিয়েছে, ওর ঠোঁটের উপর একটা টান ফিরিয়ে দিতে ভীষণ ইচ্ছা করে।

প্রমীলা আমার হাত ছাড়িয়ে দ্রুত ছুটে চলে যায়।

আমি প্রেম উৎসুক পথ চলি নির্ভিক। কুমার সাহেবের সাথে আমার কথা হয়। লোকটা নরম লোকের শমন বিশেষ। আমার কোন ভয়ঙ্কর মনে হলো না। আইন কানুন নিয়ে অনেক আলাপ হলো শেষে প্রায় বিনা শর্তেই আমার কথায় রাজি। বললো,—বিভূতিবাবু একটা আর্জি আছে।

—কী বলুন ?

—আপনি সৎ লোক ; কি বলবো ? আমাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার ইত্যাদি বাজে ব্যাপার এখনো আছে। এবং আমার বাবার একটা গোঁড়ামির জন্যই সবকিছু থেকেও দুঃখী মানুষ। আমার একটা উপকার করতেই হবে।

—আরে কি মুশকিল সংকোচ বোধ করছেন কেন বলুন না সাধ্য মতো করবো।

—শুনুন, আপনি হয়তো জানেন আমি অবিবাহিত। কিন্তু তা নয়। দশ বছর আগে আট বছরের এক কিশোরীর সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল। কথা ছিল বিয়ের পর বছর খানিক ও বাপের বাড়িতেই থাকবে। গাওনার পর আমার কাছে আসবে। আমার ধর্মপত্নীর বাবা ছিলেন গরীব। গাওনার সময় পণের জিনিসপত্র যেটুকু দেবার কথা ছিল তা তিনি দিতে পারেন নি। আমার বাবা ভীষণ রেগে গেলেন। হঠাৎই মতান্তর থেকে মনান্তর।

এখন বিভূতিবাবু তুচ্ছ প্রশ্ন তুলে আর কেউ বাধা দেবার নেই। আমি নিজের জীবনটা নিয়ে যা খুশি ছিনিমিনি খেলতে পারতাম। কিন্তু মনের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখেছি বুকের ভেতরটা শুধু ওর জন্যই কী এক ব্যথায় ভরে আছে। বিভূতিবাবু একটু চেষ্টা করে আমাদের দূরত্বটা ঘুচিয়ে দেবেন না ?

—আরে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এই মিলনের জন্য দরকার হলে আমি প্রাণ দেবো মশাই। কিন্তু কী ভাবে, ঠিক কী করতে হবে আপনার জন্য বলুন ?

—শিল্পশালার প্রমীলা মেয়েটিকে চেনেন ? সেই···।

—প্রমীলা !! ও হ্যাঁ চিনি, চিনি তো। বড় ভালো মেয়ে, আর যথার্থ শিল্পী···আমি, নিশ্চয়ই···।

কুমার সাহেব আন্তরিক ভাবে আমার হাতে হাত রাখে। হঠাৎ আমার দু'চোখের সামনে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসে—
কিন্তু আজ আর আকাশে চাঁদ উঠবে না। □

রাজা সিংহ

দেওতা

দেখতে দেখতে বছর খানেকের মধ্যে হারানের পশার ছড়িয়ে পড়লো হু-হু ক'রে। লোকেরা এখন বেহুলা থানের দিকে হাত তুলে প্রণাম করে। দূরে বাস রাস্তার ওপার থেকে শহরে কাজ করতে আসা সাঁওতাল মজুর আর ডাঁটো শরীরের সাঁওতাল কামিনরা আসে সাধু বাবাকে প্রণাম করতে। তুরী বস্তির গাঁওবুড়ো মাছমারা জাল কাঁধে ফেলে বলে, "বড়ো জাগ্রত দেও হে। সাধু মহারাজ হেই এত্ত বড়ো গুনিন। ওর সাথে গহিন রেতে কথা বলে বেউলো মা।"

বেহুলার গল্প কাঁদে বুড়ো। বাচ্চাগুলো শোনে বড়ো বড়ো চোখে।

চাল, ডাল, শাক, সময়ের ফল আম, কলা সব আপনা থেকে জুটে যায় হারানের। প্রথম মাস ছয়েক বড়ো কষ্ট গেছে ওর। খাওয়ার কষ্ট বড়ো কষ্ট। তখন ঘন ঘন হাঁস মুরগি চুরি যেতো সাঁওতাল বস্তি থেকে। এখন ওরা নিজেরাই আসে হাঁস মুরগি ভেট দিতে। বলাবলি করে, "বড়া ভারি মহারাজ গ—ই থানটো দেও'র থান মনে লয়।"

মুখে মুখে ছড়ায় থানের কথা—"উ থানে ধননো দিলি বাঁজা বউ গাভিন হয়। সব বেপদ শান্তি হয়। সাপে কাটা পেরান পায়।"

হ্যাঁ সাপের ভয় বড়ো ভয় এখানে। প্রতি বছর দুটো একটা সাঁওতাল ঘেসুড়ে ছোবল খায়। কেউ বাঁচে, মরে বেশির ভাগই।

শুধু মোটামুটি সুখেই আছে হারান। অবিশ্যি এখানে ওকে কেউই হারান বা হারু বলে না। সবাই ডাকে মহারাজ ব'লে।

শেষমেষ গ্রামটা ছেড়েই দিলো হারান। গ্রামে আর আশেপাশে চুরি ক'রে আর তার চেয়ে অনেক বেশি মার খেয়েও টি'কে ছিলো ও।

শুধু ছুলির জন্যই টি'কে ছিলো এতোকাল। ছুলির দীঘল টানা চোখের দিকে চেয়েই ভুলে যেতো সব।

মাঝে মাঝে গাঁ থেকে দূরে নদীর কিনারে আসতো ছুলি। সেখানেই একদিন ছুলির উল্কি আঁকা বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে হারান বলেছিলো, "এমুন সোহাগ আমারে কেউ করে নাই গ।"

আর সেই ছুলিই ক্যামন ড্যাং ড্যাং ক'রে চ'লে গেলো শ্বশুরবাড়ি।

হারান শেষ চেষ্টা করেছিলো একবার ছুলির মামার কাছে।

মামা হেসে বললো, "চুরের ব্যাটা চুর, আশি ট্যাকা পণ দিছে উয়ার বরটো। সে মুরোদ কাছে লিকি গ তুমার।"

সে মুরোদ অবশ্য ছিলো না ওর। সেই দুঃখেই গ্রাম ছাড়লো হারান।

পুকুর পাড়ে উবু হয়ে বসলো হারান মহারাজ। এখান থেকে আর কেউ ওকে দেখতে পায় না, থুঃ ক'রে একরাশ তামাকের থুতু ছড়িয়ে বুক উজাড় ক'রে খিস্তি দিলো। মাঝে মাঝে এমন ইচ্ছে করে। তখন ও এই পুকুর পাড়ে ব'সে খিস্তি ছায় বিশ্বসংসারকে, ছুলিকে, ছুলির বুকের উল্কিকে মায় বেহুলার থানকেও। এখন কিন্তু হারান খিস্তি করলো দূর থেকে হেঁটে আসা লোকটাকে। এই একটা মাত্র লোককেই ভয় পায় হারান। বড়া ভারি এক শহর থেকে আসা বাবুটো তার সব বুজরুকি ধ'রে ফেলে আর হাসে। কিছু বলে না শুধু হা-হা ক'রে হাসে। আবারো খিস্তি দিলো হারান। বাবুটো অবশ্য এলো না এদিক পানে। উ-দিকে বাস রাস্তার দিকে চলে গেলো কোথায়।

ফি মাসে একটা পূজা করে হারান, দূর দূরের বস্তি থেকে লোক আসে মাগী মদ্দ-বড়া ভিড় হয় ত্যাখন। বুড়ো লোক গুলান ধননো ছায় হারানের কাছে। "হেই মহারাজ ওষুদ দে একটো, বাঁজা বউ গাভিন

হবে।"—"মহারাজ গ শরীল লড়লড়ে হোল, একটো ওষুদ দে বাপ আমার।"

ওষুদ অবিশ্যি ছায় না হারান মহারাজ। ওদের নামে পূজা ছায় আট কেলাশ অবধি পড়া মহারাজ। মন্তর পড়ে জোরে জোরে। বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে থাকে লোক গুলান। মুরগি বলি ছায় ওদের নামে। তারপর আট দশ দিন ভালো খাবারের অভাব হয় না মহারাজের।

এমনিও লোক আসে মহারাজের থানে। ন্যাতা গায়ে বুড়ি আসে। নুয়ে পড়া বুড়া আসে, শঁাষালো ম্যেয়া আসে। আর হারান গাঁজায় দমভোর টান দিয়ে এক ফুসফুস ধুঁয়া নিয়ে উদের ধমমো কথা শুনায়। এমনিতে ভালোই আছে হারান। শুধু যেদিন রাতে ও স্বপ্ন ছাখে দুলির বুক জোড়া উল্কি, পরদিন সকালে ক্যামুন পাগলাটে লাগে। সেদিন ও গাঁজা খায় বহুক্ষণ উলঙ্গ হয়ে আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে আকাশ ফাটায়। তারপর পুকুর পাড়ে এসে খিস্তি ছায়. দুলিকে, দুলির বুকের উল্কিকে, বিশ্বসংসারকে।

চৈত সংক্রান্তির দিন ভারি ভিড় হয় থানে। আগে হতো না ত্যামন, গত বচ্ছর থেকে হচ্ছে। সবই সাধু মহারাজের মাহাত্ম্য। মেলাই ব'সে গেছে ছোটো খাটো একটা। নালখাদাই আর গুড়ের লাড়ু। খালপাড়ের লাল মাটি কাগজে মুড়ে বিক্রি করছে ব্রজর বাপ। বেহুলা মায়ের সিন্দুর। ওফ্ কি ভিড়। ছোটো ইট বাঁধা লাল সুতা বিক্রি হচ্ছে। বাঁশের গায়ে ওগুলো বেঁধে মানত মাঙবে মনোকামনা পুরো হবার।

আজ ভর হবে হারান মহারাজের। সবচেয়ে বেশি ভিড় সেইজন্যই। বড়ো বড়ো উৎসবে এমন ভিড় হয় হারান মহারাজের। মাথায় হাত রেখে আজ মহারাজ ভবিষ্যত বলে দেবে। মনোকামনা পূরণের জন্য প্রসাদী ফুল দেবে।

চোখে মুখে ঢুলুঢুলু ভাব আনতে আজ সাত সকাল থেকে গাঁজা টেনেছে মহারাজ। লোতুন কাপড় প'রে অনেক ফুল আর ফল দিয়ে বেহুলা মায়ের পূজা সারলো মহারাজ।

গলায় আজ লাল জবার মালা। মাথায় লাল সিন্দুরের ইয়া বড়ো টিকা। লোতুন কাপড়। গাঁজায় লাল চোখ মেলে আরসি ফিরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ দেখলো মহারাজ।

"তু লাল পাহাড়ীর দ্যাশে যা
রাঙা মাটির দ্যাশে যা
হেথায় তোরে মানাইছে না গ
ইক্কেবারে মানাইছে না"

গানটা হঠাৎই মনে পড়ে হারানের। বহুদিন আগে এক বাবুর বাড়ি রেডিওতে শুনেছিলো।

পূজা সেরে বাইরে এসে দাঁড়ালো হারান মহারাজ। বাইরে তখন ভক্তজনের ভারি ভিড়। "ভর হইছে গ সাধু মহারাজের। মহারাজ আমাদের সাক্ষ্যাত দেওতা।"

পদ্মাসনে ব'সে "জয় মা" ব'লে হুঙ্কার ছাড়লো হারান মহারাজ। ভিড়ের চোখে তখন চাপা ভয়। এবার আসবে দলে দলে লোক। অনেক মানুষ অনেক সমস্যা।

মাথায় হাত ছুঁইয়ে আশির্বাদ ক'রে প্রসাদী ফুল তুলে দিচ্ছে সাধু মহারাজ। প্রণামী ফল মূল পড়ছে পাশের ঝুড়িতে। টাকাও পড়ছে কখনো একটা দুটো। তবে পয়সা বড়ো কম এখানকার লোকের হাতে। কিছু লোক উপযাচক হয়েই ভিড় সামলাচ্ছে নিজের হাতে। কর্তৃত্ব ভালোবাসে সব শ্রেণীর মানুষই। অনেক লোক আজ। সব লোককে আশির্বাদ না ক'রে ছুটি নেই সাধু মহারাজের।

পর পর পাঁচটা টাকার ঠনাঠন্ ধাতব আওয়াজ শুনে চোখ মেললো মহারাজ। আর তখনই শিউরে উঠলো যেনো। পাঁচটা সাপ

শিরশিরিয়ে উঠলো হারান মহারাজের শিরদাঁড়ায়। কালোকোলো জোয়ান লোকটা দাঁড়িয়ে আছে জোড় হাতে। মুখে বড়ো করুণ আর্তি আর তার পেছনে একটু তফাতে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে দুলি।
হ্যাঁ দুলি। তেমনি কালো চিকন মুখশ্রী চকচক করছে ঘামে। টানা দীঘল চোখ। আর আঁটো-শাড়ির ফাঁকে বুকজোড়া উল্কি। যে বুকে মুখ রেখে হারান মহারাজ—।
হারান মহারাজের মস্তিষ্ক ফেটে যাচ্ছিলো মুহুর্মুহু। চোখের সামনে থেকে মুছে যাচ্ছে মানুষজনের ভিড় আর কোলাহল। চারদিকে শুধু বিস্তৃত নীল। আর দিগন্তজোড়া বিশাল উল্কি। দুলির কামুক ঠোঁট, গান আর আকাশ জোড়া উল্কির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে পাথর হতে হতে হারান মহারাজ শুনতে পেলো লোকটা বলছে, "হেই মহারাজ ওষুদ দে একটো বাঁজা বউটো মোর গাভিন হবে। হেই মহারাজ বাঁজা বউটো……।"
নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে উল্কি আঁকা আকাশের নিচে বেহুলা থানের দেওতা হয়ে গেলো হারান মহারাজ। □

জুলফিকার মুসাং

ঘটনার ইতি গল্পের শুরু

॥ ঘটনা ॥

মাত্র তিরিশে নিখিল মাস্টার চলে গেলেন ওপারে। স্ত্রী পঁচিশ, সঙ্গে নয় আর ছয় দুটি সন্তান নিয়ে পড়ে থাকলো এই মায়া ধামে। জগতে কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না—সবাইকেই একদিন চলে যেতে হবে—শোক করে আমরা মিথ্যে কষ্ট পাই মায়ার সংসারে। স্বর্গের পথে বাধা হই—প্রবোধ দিচ্ছিলো, নিখিল মাস্টারের গুরুভাই—নিখিলের আত্মার যাতে শান্তি হয় তার জন্যে যা করণীয় তাই করতে হবে বৌমা কাঁদলে তো ফিরে আসবে না সে।

॥ গল্প ॥

সকাল থেকে বেলা বাজলো চারটে একটাও মরা আসে নাই। মোটর বাইক থেকে নেমে শ্মশানঘাটের মালিক কেষ্টদাস ক্যাসবাক্সের উপর বাঁ হাতের কনুই-র ভর রেখে গালে হাত দিয়ে ভাবছিল—এমন অলক্ষণে দিন তো যায় না, শনির কোপ! মনেমনে কী ভেবে ক্ষুব্ধ হয়। রাগে গরগর করে—রামাই, রামাই বলে ডাকতে থাকে। গলার আওয়াজ যেন হুংকারের মত শোনাতে লাগলো জনশূন্য শ্মশানঘাটে। রামাইকে দেখা গেলো না। শুধু প্রতি হুংকারে তার মুখের ঘাড়ের মেদজমা মাসপিণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়। সম্ভ্রান্ত চেহারা কেষ্টদাসের। শহরের সম্ভ্রান্ত এলাকায় সুদৃশ্য মনোহরণ বাড়িটি সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়, পথ চলতি মানুষ থমকে দাঁড়ায়।

মাত্র একটি শ্মশানই সম্বল নয়, এ ছাড়াও চারটি শ্মশান আছে—যা চার ছেলে দেখাশুনা করে। শহরে আছে আরেকটি লক্ষ্মীমন্ত দেশী মদের দোকানও।

শ্মশানের শেডের অদূরে ঝুপড়িতে রামাইয়া দেশী মালের পাইট থেকে মাটির ভাঁড়ে মাল ঢালছিলো সাথে কাঁচা লংকা আর নুনের চাট।

এক ভাঁড় গলায় ঢালতেই—কৃষ্ণদাসের হুংকারের গর্জন শোনা গেলো। রামাইয়ার ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়। আরেক ভাঁড় মদ গলায় ঢেলে দেয়। ভেতরে ভেতরে গজরায় শালে মাগ্‌গিখোর, হামার বহুকে বাচ্চা হোবে, আগারিমে মেংগেভি দেশমে ভেজনেকা টাইমে শালে আগাম রুপেয়া দেয় নাই। অ্যাই রামুয়া, শুয়োর কে বাচ্চে কিধার হ্যায়রে রেনডিকে বাচ্চে—কেষ্টদাসের হাঁক এগিয়ে আসে ঝুপড়ির কাছে। আতে হ্যায় জি—রামুয়া উত্তর দিতেই তার ঝুপড়ির সামনে কেষ্টদাস ফেটে পড়ে—শালে ঘাটমে সবেরসে মুর্দা আসে নাই—আউর তু শালে মাল শাটাইছিস?

লেকিন ম্যায় কা কারু—উত্তর দেয় রামুয়া।

কা করে, শালে পূজা চড়াইছিস, এতনা বেলাসে মুর্দা আতা নেই, তো পূজা চড়াইছিস? আবে রেনডিকে বাচ্চে, শালে তলব ফকোট মে লেগা? বধুয়া কিধার?

ঃ উ শহরমে গই, রাতমে ডিউটি হ্যায়।

আপ যাইয়ে, ম্যায় আতা হুঁ। কেষ্টদাস গরগর করতে করতে শেডের দিকে পা বাড়ায়।

রামুয়া পুরো মদের পাইট গলায় ঢেলে দিয়ে চিতার গর্ত খোঁড়া ক্ষয়ে যাওয়া কোদাল, মাটির কলসি, মুড়ো ঝাঁটা বাগিয়ে শেডের কাছে উপস্থিত হয়। ততক্ষণে কেষ্টদাস শেডের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি গঙ্গা ছিটিয়ে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ভুঁড়িওয়ালা সিদ্ধিদাতা গণেশের কাছে নতমস্তক হয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পাঠ করছে। লক্ষ্মীর টাটে বারবার

মাথা ওঠানামা করছে। শনির কোপ, যমরাজার স্মরণ করে মানস নেত্র হয়ে রামুয়া তুলসীতলাতে গঙ্গা দিয়ে ধুয়ে মুছে সেখানে মাটির ঘড়াতে গঙ্গা ভরে মুড়ো ঝাঁটা, ক্ষয়ে যাওয়া কোদাল স্থাপন করে, ধূপ কাঠি জ্বালিয়ে দিয়ে মালিকের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

কেষ্টদাস চোখ তুলতেই সামনে রামুয়াকে দেখে হুংকার দিয়ে উঠলো— যা পূজা চড়াইছিস শালে, লক্ষ্মীর টাট ফাঁকা যাচ্ছে। আর শালে— তু—

ঃ পূজা আপনি ভি লাগাইবেন না—

ঃ আবে শালে তু লাগা। তুকে তো বলাই আছে—ও পূজা তুকে করতে হোবে—যা জলদি বে।

রামুয়া তুলসীতলাতে পূজা করতে থাকে চোখ বুঁজে। ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয় রামুয়া, শালে মালটার মৌজ দিলো তো নষ্ট করে—শালে, হামি কি যম আছি যে মানুষকে মতলব মাফিক মুর্দা বানাই শালে তোর শ্মশানে লিয়ে আসবো? শালে মুর্দা তো হামারও চাই। আগাম রুপেয়া দিলো না মালিক, বহু দেশমে গইল বাচ্চা হোনে লাগি। চিঠ্ ঠিভি আয়া রুপেয়া ভেজনেকে লিয়ে জরুর। লেকিন ক্যয়সা চিজকা কিমত বাড়তা, ক্যায়সে সন্‌সার চলে গা? দো লেড়কা লেড়কি হামরে। যেতনা তলব মিলে, ওসমে তো চলতা নেহি। লেকিন শালে তলব বাড়াবে নাই; তো বাঁচেঙ্গে ক্যায়সে? বহুর পেট উঁচা শরীরটা ভেসে ওঠে রামুয়ার চোখে—বালবাচ্চা। মুর্দার গর্ত খুঁড়ে দিয়ে চিতা সাজাই দিলে, পুড়াই দিলে রোইস আদমীদের গাঁট কাটাই যায়। লেকিন রইস আদমী মরতা নেহি। যা শালে গরীব কা মুর্দা আতা—ও শালে হামরা মাফিক আদমী, ও শালেলোগ আপনা হাতমে সব করতা, পয়সা আনেকা ধান্দা হোতা নেহি। বুড্ডা মা বাপ দেশমে খেতি করকে দুখমে চলতা। আভি বহু গইল—ইধার রুপেয়া নেই

ভেঙ্গেগে। পেটমে যো আতা, সব মিলকে মরেগা। লেকিন মুর্দা আতি নেই, বড়া আদমী রইস আদমী কো মরনা চাহিয়ে তব না পয়সা মিলে। মরতা শালে ভুকসে মরনেবালা লোগ। মদ খাওয়া রামুয়ার ভেতরে ভেতরে প্রতিক্রিয়া হতে থাকে।

নিজের দীনদুঃখী জীবনের দিনপঞ্জী পড়তে থাকে। নিরবে তুলসী-তলাতে জ্বলে যাচ্ছে ধূপ, সুগন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে, সাক্ষী দাঁড়িয়ে আছে ক্ষয়ে যাওয়া কোদাল, মুড়ো ঝাঁটা, ফাঁকা মাটির কলসি, তুলসী গাছ—অলক্ষ্যে আবাহন যমকে যে দিতে পারে কেষ্টদাসের লক্ষ্মীর টাট পূর্ণ করে।

নিখিল মাস্টারের মরা এসে গিয়েছিলো। শ্মশান বন্ধুরা মরা গঙ্গার ধারে নামিয়ে অপেক্ষা করছে চিতার গর্ত কাটার এবং কাঠের জন্য। সুলেখা এবং দুই সন্তানকে অদূরে বসিয়ে দিয়ে ওর ভাই অসীম এবং ঠাকুরপো বিমান কেষ্টদাসের সাথে পোড়ানোর খরচ খরচা নিয়ে দরদাম শুরু করেছে। অমায়িক ব্যবহারে কেষ্টবাবু জিনিষ-পত্রের দামের তুলনা করে বুঝিয়ে দিচ্ছে মরা পোড়ানোর খরচা সেই তুলনায় পড়ে আছে কোন্ আদ্দিকালের রেটে, আর এখন লাভও থাকে না লোকলস্করের মাইনাপত্র চালিয়ে—এবার তো শ্মশানের ডাক ওঠলো দেড়লাখ টাকা থেকে আড়াই লাখ টাকা। নিতামই না, নিয়ে আসছি—তাছাড়া এলাকার লোকজনের সাথে একটা ভাবখাতির হয়ে গেছে। সবাই বলে কেষ্টর ঘাট। কী আর করি বলুন। লোকসান লাগলেও ঐ ভেবে। ছাড়তে পারিনা। আজকাল ভদ্রলোকেরাও এ লাইনে ঢুকে গিয়ে কমপিটিশন, আরও ভাত মারা যাচ্ছে। বিমান নিখিলের অবস্থা বুঝিয়ে রেটটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করতেই অসীম সরকারী রেটের কথা তোলে—। বোধকরি অগোচরে ক্ষুব্ধ হয় কেষ্ট।—তা ঐ রেট মেনে কি মরা পোড়াতে পারবেন? আধ পোড়া করে ফেলে দিতে

হবে, পারবেন ? সরকারী হিসাব ঐ কাগজকলমেই থাকে—বলুন না সরকারী নিয়মে কোনটা চলছে ? আসীমকে চুপ করিয়ে দিয়ে বিমান মাঝামাঝি একটা রফা করে। লোক চায় গর্ত কাটার আর চিতা সাজানোর। ছেলেদের হাঁক দিতেই হাতে হাতে কাঠ বইতে শুরু করে তারা।

রামুয়া পূজা করছিলো। বাবুর ভারি গলার হাঁক শুনে চোখবোঁজা মদ-জড়িত গলাতে যাচ্ছি বলে, পুনরায় পূজাতে মনোযোগ দিলো। তার ঠোঁট পড়ছিলো না, যা দেখে বোঝা যায় সে মনেমনে মন্ত্র পড়ছে। আসলে নিরিবিলিতে একদিকে মালিকের খিঁচুনি আরেক দিকে—নিজের সংসার—সে সব কথাই বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিলো বৌয়ের মুখটা, উঁচা পেট। ছুটো হাড্ডিসার বালবাচ্চা। বুড্ডা বাপ বুড্ডি মাইজির কথা, সারে জীবন মেহনত করতে করতে মরলো। আপনা জমিন তো নাই। বুড্ডা বাপ মাইজি খেতি করে অন্যের জমিনে, সিখানেও এখন বড় ঝুটঝামেলা চলছে। দিন মজুর ছোটি কিষানলোক সব জোট বাঁধি বড়া জোতদার জমিনদারকো সাথে লড়াইতে নামছে। এতনা দিন বাদ ইজ্জৎ কি সওয়াল তুলছে। চৌধুরী রাজপুতরা যারা এতদিন বেগার খাটাতো ইচ্ছেমতো এদের যা খুশি তাই করতে পারতো। ঘরের মেয়েদের ইজ্জতভি লুটতো। লেকিন এখন পারছে না। রামুয়া ওদের নেতার সাথে বাত বলেছে মেহনতি মানুষকে নাড়া লাগাতে হবে। লড়াই করতে হবে। মারকা বদলা মার দিতে হবে। কেড়ে লিতে হোবে ওদের জমিন। অবাক হয়ে যায় রামাইয়া যাদের ঘরে খানা নেই লেংটিসার সেইসব আদমী লড়ছে। অস্ত্রভি চালাইছে জোতদার জমিনদার বাহিনীর টক্কর লিচ্ছে কা বলে হা গরিলা কায়দামে।

অসীম অবাক বিস্ময়ে রামুয়ার পূজার আয়োজন দেখে। এ ধরনের মুড়ো ঝাঁটা, ক্ষয়ে যাওয়া কোদাল, আর মাটির কলসি তুলসীতলাতে রেখে

পূজা জীবনে প্রথম দেখলো। রামুয়া চোখ খুলতেই সামনে অসীমকে দেখে একটু তাড়াতাড়ি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে বললো, চালিয়ে। কোদাল, মুড়ো ঝাঁটাটা পূজা তলা থেকে নিয়ে নিখিলের সাথে চলে গঙ্গার দিকে যেখানে চিতা সাজানোর জন্যে অপেক্ষা করছে অন্যরা। রামুয়ার চোখ মদের প্রতিক্রিয়ায় জবাফুলের রঙ। গলা জড়িয়ে আসে কথা বলতে, চোখে একটা আবেশ—ঘুমঘুম ভাব। ওর কিছুই ভালো লাগছে না —বারবার বৌয়ের মুখটা ভেসে ভেসে ওঠে, ঘরে রুপেয়া ভেজতে হবে। চিন্তায় প্যাক খেতে থাকে বারবার। মালিক আগাম রুপেয়া দিবে না মুনিয়া, ওর বহু বলেছিলো, বলেছিলো ও মাগ্‌গিখোর রুপেয়া দিবে লাই তু দেখে লিস। এতনা জোর দিয়ে বলাতে রামুয়া উকে পুছেছিলো কি কারণ—মুনিয়া গোখুরার মতো ফোঁস করে বলেছিলো উ শালে কিধার গে বাচ্চে, হামকো বুধুয়ার বহু সমঝেছিলো। লেকিন উর মতলব হাশিল হোলো না হামার ইজ্জত লুটতে পারলো নাই। বড় লোভ ছিলো হামার গতরটার উপর। দিবে না রুপেয়া, উ রেনডির বাচ্চা দিবে লাই। বহুর কথাগুলো মনের ভেতর বারবার উঁকি মারে। ভুলতে পারে না। মদ তাতে আরও মদত বাড়িয়েছে। দেশ থেকে লড়াইকে আদমী কা সাথ ভেট হওয়াতে ও মদ ছাড়ার চেষ্টা করছে। ইজ্জৎ কি বাত, ইজ্জৎ ছিন লেনে পড়েগা। বারবার লছমনলাল কমরেডের কথা মনে হয়। "বদলা লেনা চাহিয়ে, ও হিম্মৎ হামলোগকা হ্যায়, ইসিলিয়ে হামলোগকা সবকো একতা বানানা চাহিয়ে।" জানতে চেয়েছিলো বংগালকা লড়াই সমাচার। নকশাল বাড়িসে লড়াই তো হোয়েছিলো হামরা তো তারই রাজনীতি নিয়ে লড়ছি। লজ্জা পেয়েছিলো রামাইয়া ও ইসব কিছুই জানে না। শ্মশানে মরা পোড়ায় পয়সা মিলতে মদ খায় চুর হোয়ে এখানেই থাকে। বাইরের জগত এদের দেখে না। এরা তো গুটিয়ে থাকে নিজের জগতে পেটের ধান্দায় অথবা উপোষে ব্যাস। লেকিন বাদ সাধিয়েছে লছমন।

ভাবাই দিছে। পাঁচটা মরদ ইখানো কাম করে। বালবাচ্চা বহু লিয়ে উদের থাকতে হয় মরার ফেলে দেয়া কাপড়-চোপড় বাঁশ লকড়ি দিয়ে বানানো ঝুপড়িতে। মালিক ওদের মাথা গুজরানোর ছাউনি বানাই দেয় নাই। রামুইয়া সি কথা এক সময় মালিককো জানাইছিলো। বর্ষাতে ঘরে পানিতে ভিজে ভিজে বালবাচ্চা নিয়ে বসবাস করা যাচ্ছে না, মালিক ধমকে উঠেছিলো। শালে ডোমকে বাচ্চা, তোম কেয়া পাকা মকানমে রহেগা। রামুয়া মতলবে আছে ইউনিয়ন বানাইবে ও লড়বে ইজ্জৎকে লিয়ে ইজ্জৎকে সাথ। জুলুমবাজী, তনাশাহী নেই চলে গা। শালেলোগ সবারই ইজ্জৎভি খাইছে। গরীব গরবা দেশওয়ালী নৈকর পেট কা ধান্দামে ইসব মান লেনেই হোতা; লেকিন আউর মান লেগা নেহি। যখন সাদী হয় নাই, রামুয়াও তু একজনের বহুর ইচ্ছায়ভি নিজের তাগড়াই তবিয়ত খুশিমে লুটাই দিছে। লেকিন, সাদীকো বাদ একদম ওদিকে পা বাড়ায় নাই। লজর ভি লাগায় নাই। লজ্জা হয় রামুয়ার ইসব ভাবলে এখন। ঘৃণা হয় কৃতকর্মের জন্যে।

চিতাস্থানের মাটি কাটতে কাটতে রামুয়া বলে হামার ডিউতি খতম। লেন। একজন ওকে চিতা সাজিয়ে দিতে বললো, "পঁচিশ রুপেয়া দিতে হোবে—হাঁকে, এক পয়সাভি কম দিলে হোবে না। নইলে নিজ হাতে সাজাইতে হোবে"।—ঐ দেখ ভাই বহুত গরীব আদমী আছে, আর দেখছো এই বয়সে মরলো এ তুটো বালবাচ্চা রেখে আর ঐ কচি বৌ রেখে, তুমি ভাই বুঝেসুজে যতটা কম পার বলো ভাই। রামুয়া তাকিয়ে দেখলো যেখানে অসীম বোনকে আর তুটো বাচ্চাকে সামলে রেখে প্রবোধ দিচ্ছে। রামুয়া চিতার কাঠ সাজাতে ব্যস্ত হতেই কে একজন বলে ওঠে, আগে বলে নাও, পরে ঝামেলা করে লাভ নেই। রামুয়া ওর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে চিতার কাঠ ক্ষিপ্র হাতে সাজাতে থাকে। নিখিলের দেহটা চিতাতে তুলতেই, চিৎকার করে কেঁদে ওঠে সুলেখা।

জোর করে ধরে রাখে অসীম ওকে। পা ভেঙে মুড়ে কাঠ ভাঙলো মতো সাজিয়ে দিয়ে জানতে চায় পুড়াবে নিজেরাই তো? ওরা সবাই বলে, হ্যাঁ, আমরা নিজেরাই এবার সব পারবো।

ঠিক আছে। হনহন্ করে যেতে যেতে ও বলে যায় কোন অসুবিধে হলে ঐ ডেশের কাছে ঝুপড়িতে খবর দিতে।

চিতাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। হরিধ্বনী ওঠে বারবার। সুলেখা হতভম্বের মতো চিতার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিহ্বল হয়ে আর চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝেই দমকে দমকে বলছে—কী করে বাঁচবোরে দাদা কী করে বাঁচাবো ওদের কিছুইতো রেখে গেলো না। বর্তমান পুড়ছে, ভবিষ্যত অন্ধকার। কী করারই বা আছে অসীমের। নিজের সংসারই দিন আনা দিন খাওয়া। খাটলে খাওয়া নইলে উপোস। এই নিখিলই কম যায়নি কথাতে। তর্কাতর্কিও কম হয়নি অসীমের আগে। অসীমের রাজনীতি নাকি হঠকারী। অভিযুক্ত করেছে কত কথার ফাঁকে সে বাপের টাকা নয় ছয় করে রাজনীতির বিলাস করছে। ধর্ম মানে না জাত মানে না। মানতে পারে না অসীম ধর্মের বাজে বুজরুকি আর কুসংস্কারকে। কিন্তু এই সব জ্ঞানী লোকদের কর্মকাণ্ড দেখলে এত দুঃখের মধ্যেও ঘৃণা ঝলসে ওঠে। মনে হয় বোনকে আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দেয়—দেখ তোর স্বামী দেবতা। দেখ তোদের গুরুকে, যে বলে স্বামীহারা হয় কোন নারী, যে নারী পরদার গমন করে অন্য পুরুষে আসক্ত আছে তারই স্বামী মারা যায় এবং বিধবা হয়। মিলিয়ে দেখ বোন তোদের গুরুবচনের সাথে। মানতে হবে চারি বর্গ বর্ণাশ্রম। তাতো বটেই। নইলে মানুষে মানুষে বিভেদ থাকবে কেমন করে? আর শোষণই বা হবে কেমন করে? গুরুর ভুঁড়ি বাড়বে, মন্দির বাড়বে আর রোজগার স্থিত থাকবে স্বর্গের ভয় দেখিয়ে এখানে নরক না বানালে? কোথায়

গেলো গুরুভাই নারায়ণ দাস যাকে বারবার খবর দিয়েও এলোনা একবার। পাছে ভয় সুলেখা এ সময় তার পাওনা টাকা চেয়ে বসে। চাইলেই কি দিতে পারতো না ?—সে ক্ষমতা আছে—সুলেখা বারবার শোকে উতলা হয়ে সে কথা বলে। চুপ করে থাকে অন্য গুরুভাইরা। কিন্তু···নিখিল নিজের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা লোন তুলে দিলো ঐ হাতুড়ে ডাক্তার নারায়ণ দাসকে এক বছর বাদে ফেরত পাবে ভেবে। দুবছরেও মিললো না সে টাকা। গুরুজির মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে বলে নিলো—করলো নিজের বাড়ি। মাইনাপত্র ধার বাকি করে বাড়িতে গুরুর উৎসব। যখন ধারদেনাতে হাবুডুবু—সুলেখা শুরু করলো, মানুষের অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেতে, ঠোঙা বানানো। কৃচ্ছসাধনা। আর গুরুর পরম প্রিয় ভক্ত যার জমি জায়গা আছে কিনে খেতে হয় না, বরং বিক্রি করে। চিকিৎসার নামে অলক্ষ্যে পেট খসানো ব্যবসাতে ওস্তাদ। যাতে রোজগার করে দিব্বি বাড়ি, গুরুর মন্দির সাজিয়ে নিয়েছে। আর এই প্রাইমারি শিক্ষক নিখিল ? জমিদারের বাচ্চা, জমিদারের অর্থনৈতিক ভিত যখন টলে গেছে, তখন নূতন প্রতিপত্তির রাস্তা এই ধর্মকে অবলম্বন। আর সেই প্রতিপত্তি অর্জনের জন্যে রাত নাই দিন নাই আজ এখানে কাল ওখানে কীর্তনের দল নিয়ে নাম প্রচার আসলে নূতন মোড়কে প্রতিপত্তি সমীহ আদায় করা। ছোট বেলা থেকেই শ্লেষ্মার ধাত ছিলোই আর অনিয়মে যা হবার তাই হয় মাঝে মাঝেই দম-কষ্ট, বিছানা নেয়া। বোনরে সব ভালো, অন্ধত্ব ভালো না। স্বামীর পা ধুয়ে জল খাওয়া। গুরুর চরণ ধুয়ে নিজের চুল দিয়ে পা মুছে দেয়া, সেই জল পান করা। গুরুর এঁটো ভাত—ভুল হলো অন্ন-মহাপ্রসাদ খাওয়া। আহা এই তার পরিণতি !
শয়তান নারায়ণ দাস ঠিক চিকিৎসাই করলো বটে একেবারে স্বর্গে দিলো পৌছে। আমাদের কথা ছাড়, আমরা সব ঘটনার কার্য কারণ

তার অতীত বর্তমান ইতিহাস জানতে চাই, বুঝতে চাই ভবিষ্যত। আমাদের শরীর থাকতে নেই। খিদে থাকতে নেই। ভালোবাসা প্রেম থাকতে নেই। আমরা উগ্রপন্থী। হটকারী। ঠিকই তো অচলায়তন না থাকলে চলবে কেন? মনে হয়, নারায়ণ দাসের মুণ্ডটা এককোপে কেটে নি, শুয়োরের বাচ্চার জন্যে আজকে মরতে হলো নিখিলকে, ভবিষ্যত শূন্য সুলেখা আর দুটো বাচ্চা—ধর্ম! বোঝ এবার। কেমন বিশ্বাস, গুরুভাই আমাকে ভালো করে দেবে— দিলোতো ভালো করেই। তুমি তো গেলে, সঙ্গে করে কী নিয়ে গেলে? সব রেখে গেলে তোমার কৃতকর্মের ফল—, পা ভাঙলো গরু বাঁধতে গিয়ে নিখিলের। আচমকা গরু দৌড় দেওয়াতে। তার চিকিৎসার ভার নিলো গুরুভাই ডাক্তার, কিছু ট্যাবলেট আর মিক্‌চার খাওয়াতে যখন ব্যাথা না কমে পা ফুসতে লাগলো কলাগাছের মতো। তখন বাঁশের চটি দিয়ে বেঁধে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে অভয় দিলো ভয় নাই গুরু ভরসা। লোকজন দেখে বললো, পা ভেঙে গেছে এক্সরে করে সঠিক চিকিৎসা করাতে, না গুরুভাই ভালো করে দেবে। ভুলভাল চিকিৎসা করে, স্টমাকটা পচে গ্যাছে, ডাক্তার বাবু বললো,অন্তত মাস দুয়েক আগে আনলে এই তরতাজা মানুষটাকে মরতে হোতো না। হসপিটালের ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে প্রথম দিনেই। শেষ চেষ্টাই হোলো জলের মতো টাকাও খরচ হোলো। কিন্তু নিখিল বাঁচলো না। নিজেও মরলো মেরেও গেলো তিনটি প্রাণীকে। তবুও বেঁচে থাক অহেতুক ভক্তি। মায়ার জগত নিয়ে ভেবে লাভ কি ঈশ্বর চিন্তা করো বোন। অসীমের ভালো লাগছিলো না বসে থাকতে—তারপর মনের ভেতর একটা খচ্‌খচানি ঐ যে রামুয়া পূজা করলো—কী পূজা। পায়চারি করতে করতে রামুয়ার কাছে চলে এলো—তাছাড়া ওকে সাজানোর টাকাটাও দেয়া হয়নি। ঝুপড়ির কাছেই রামুয়াকে পাওয়া গেলো, রামুয়াকে কত টাকা দিতে হবে জিজ্ঞাসা করায়—ও বললো দিতে হবে

না। কিন্তু অসীম বারবার জোরাজুরি করাতে বললো—হামার ঘরেও তো বালবাচ্চা আছে—

হামরাও মানুষ আছি। ওটুকুন বালবাচ্চা ঐ টুকুন বঁহু, ওদের বাঁচান। উ পয়সা দিতে হবে নাই। কোন ফাকে বিমান এসে অসীমের পাশে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি। বিমান পনেরটা টাকা রামাইকে দিতে বলে তাড়াতাড়ি চিতার কাছে আসতে বলে চলে যায় একটা সিগারেট জেলে, রামাই ততক্ষণে দেশি মদের একটা পাইট থেকে মাটির ভাঁড়ে মদ ঢেলে খাওয়া শুরু করেছে। ভালো লাগে না অসীমের ব্যাপারটা। এদের মদ খাওয়া—এত পরিশ্রমের পয়সা, ঘরে বালবাচ্চা সংসার এসব ভুলে গিয়ে মদ খেয়ে সমাজ সংসার ভুলে এতেই ডুবে থাকা। বারবার মনে হতে থাকে মনের ভেতরে পূজার ব্যাপারটি, রামাইয়া এরই মধ্যে পুরো পাইট শেষ করে দিয়েছে। চোখ লালভাঁটা। আচ্ছা রামাইয়া ভাই আমরা এসে তোমায় একটা পূজা করতে দেখলাম—পূজাটা কি ব্যাপার বলবে—

ওঃ টাট ফাঁকা যাচ্ছে। সারেদিনভি একটোও মুর্দা আয়া নাই—তাই পূজা, এ পূজে মে মুর্দা যাতে আসে, তাই……

চমকে ওঠে অসীম কী আশ্চর্য! পিশাচ অর্থাৎ যমের পূজা, কারা এরা! মানুষের প্রিয়জন মারা যায় কত ঘর অকালে ধ্বসে যায় একটা মৃত্যুর কারণে আর এরা কামনা করে তাদের মৃত্যু যাতে এদের পয়সা হয়! ঘৃণায় রিরি করে ওঠে ভেতরে ভেতরে। কী সমাজ বিন্যাস কারও মৃত্যু এদের লাভ। অথচ কিছুক্ষণ আগেই টাকা দিতে চাইলেও টাকা নিলো না, সুলেখা এবং বালবাচ্চাদের কথা ভেবে এই রামাইয়া। মিলিয়ে নিচ্ছিলো তা নারায়ণ দাসের সাথে। পাঁচ হাজার টাকার হিসেব নিশ্চয়ই শোধ হয়ে গেছে নিখিলের চিকিৎসার দৌলতে। হ্যাঁ—কড়া হবে অসীম। বোনকে বুঝিয়ে দেবে কারা এরা। সব মিটে যাক। একটু শান্ত হয়ে আসুক সব।

কিন্তু ভাই কিছুক্ষণ আগেই তো তুমি মানুষের মরা কামনা করে পুজা দিচ্ছিলে—

যেন কথাটা খচ্ করে লাগলো রামুয়ার।

কিন্তু বাবুজি, সাধে কি ইচ্ছে করে কি কামনা করি? মরা না এলে মালিক হামাকে রাখবে? আর না রাখলে বালবাচ্চা নিয়ে তো উপোসে মরতে হবে কিনা! এই তো বাবুজি, আজ সকাল থেকে মরা আসে নাই। বাবু হামাকে গালি দিলো, পূজা চাপাই নাই বলে। তো বলুন হামি বাধ্য হচ্ছি কিনা পূজা দিতে? মদে চুর—চোখ লাল হয়ে উঠেছে রামুয়ার কিন্তু একটি কথাও মাত্রা ছাড়ায়নি।

আপনিই ভাবুন তো,— উকিলেরা, ডাক্তার বাবুরা, মহাজনরা সমাজের গণ্যমান্য বাবুরা কি মানুষের মঙ্গল কামনা করে?—মামলা-মোকদ্দমা যত বাড়বে—উকিলের পকেটে পয়সা আসবে, বাড়িগাড়ি হোবে, বিবির গয়না হোবে। মানুষ যত বিমারিতে ভুগবে—তত না ডাক্তার বাবুর পয়সা হোবে। মানুষ তার প্রিয়জনের জন্যে থালা-বাসন ঘটিবাটি বেচে চিকিৎসা করাবে—তবে না শান্ত হোবে। লেকিন হামরা ছোটা জাত মরা পুড়াই। পয়সা লেই। হামাদের বেলা হাজার দোষ। কেনে? হামরা তো পেটকে ধান্দাকে লিয়ে পয়সা চাই—আউর উনারা?

পোড়ানো শেষ হোলো বোধ করি। এতক্ষণে শোনা গেলো সুলেখার অস্তিত্বহীনতার কান্না—বাচ্চাগুলোর চিৎকার।

অসীম সেদিকে পৌঁছে দেখলো মরা পোড়ানো শেষ নাভিমুল গঙ্গাতে ডোবানোর জন্যে বাঁশ ছুঁচালো করে ডগাতে নাভিমূল বিঁধিয়ে গঙ্গার ভেতর পুঁতে দিতে গেলো। তাগড়াই কিছু শ্মশানের মরা খেগো কুকুর জলের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে জিব বার করে লোলুপ মুখে। বাঁশটা পুঁতে ডাঙার ওপরে আসা মাত্রই কুকুরের দল ঝাঁপিয়ে পড়লো জলের ভেতর নাভিমূলের জন্যে। □

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

রামাল্লা ও হানিফেরা

চোখের কোলে টলটল পানি জমে ওঠে নছিবনের। ঠোঁট কামড়ে ধরে। এখন ঝরঝর করে কেঁদে ফেল্লেই হয়।

এ-সব নছল্লা সইতে পারে না হানিফ। তার ধাতে নেই। বেরুচ্ছে একটা শুভ কাজে জানিস, আর অমনি শুরু করলি বাজারের মাগীদের মত ঢং। তবু যদি নিকে করা বউ হতিস, তাহলেও না হয় কথা ছিল। পাশের ঘরে পড়ে রয়েছে তোর সোয়ামি, না হয় মারাই যাবে দু-দিন বাদে, এখনও তো জেন্দাই আছে—তবে? উপরআলা বলে কি কেউ নেই নাকি ভেবেছিস?

ফেকু ঠিকই বলেছিল, আজকাল মনে হয়। বলেছিল যে, 'পরের বউয়ের সঙ্গে নটঘট মোট্টে ভাল নয়। পয়সা দিলাম, কাম করলাম, চলে আলাম। তখন তুম্‌মো বা কে, আম্‌মো বা কে। এ-সব সেহানে চলবে না নে, বোকচন্দর। গুড়গুড়ি পনের টান বোজ? দু-হাত দেখবি তহন দশ হাত হয়ে গেচে। এই টান তো এই টান। সি-টান কাটায়ে বারায়ে আসার মত মরদ তুই নারে শালা। বলে কত সাধু-সন্নেসী তলেগে গেল। তুই তো তাদের এক লোমেরও যুগ্যি নোস।'

নছিবন এখন সত্যিই ভয়ঙ্কর।

নছিবনদের বাড়িতে প্রথম গিয়েছিল ওর ভাই সাদেকের সঙ্গে। তারা তখন এক দলের লোক। একটা রিভলবার দিন কয়েকের জন্য লুকিয়ে রাখার দরকার হয়ে পড়েছিল, সে-সুবাদেই। এক কথাতেই রাজি হয়ে গিয়েছিল। তার সোয়ামি ছিল তখন সে-মহল্লার নামী

লোক।' পুলিশের সঙ্গে দোস্তি ছিল। তাই নিশ্চিন্ত হয়েই চলে এসেছিল। কোন কথাবার্তা হয়নি সেদিন। তবে সাদেকের বোনটির একটা ছাপ হয়তো তুলে নিয়েছিল। পরে তাই মনে হয়েছিল। আলাপ হলো 'চিড়িয়া' ফিরিয়ে নেয়ার দিন। সে একাই গিয়েছিল। অল্প-স্বল্প মামুলি কিছু কথা। উপদেশ-টুপদেশ—'এ-সব ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন কাম কর।' সবাই যেমন বলে। কথা বলতে তো কোন খরচা নেই। বললেই হলো যা কিছু!

কিন্তু এ-কথা তোমাকে কেউ বলবে না যে সেই 'অন্য কামটা' মিলবে কি করে। যেন তারা জন্ম ইস্তকই এ-সব করছে। চেষ্টাচরিত্র করেনি, ধরাধরি করেনি। হ্যাঁ, পড়াশোনাটা হয়নি। ছ ক্লাশেই ছেড়ে দিতে হলো। 'নেড়ে নেড়ে' বলে এমন পেছনে লাগল ছোঁড়ারা! একদিন চেয়ার তুলে এক বজ্জাতের মাথায় বসিয়ে দিয়ে সেই যে চম্পট দিল আর ফিরে যায়নি। তারপর লেগে গেল দীলখুশ হোটেলে বয়ের কাজে। মাস আষ্টেক পর কাজটা চলে গেল। একটা শিক কাবাব চুরি করেছিল। কাবাব খাওয়া তো হলোই না, জামাপ্যান্ট খুলে নিয়ে নাঙ্গাবাবা করে রাস্তায় নামিয়ে দিল মালিক, শালা খচ্চরা আফিক আলি। লোকজন মজা পেয়েছিল। বেজন্মার বাচ্চারা টিটকিরি দিয়েছিল, পাগলা কুত্তাকে যেমন করে তাড়ানো হয় তেমনি করে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল নানা আওয়াজ করতে করতে। কান্নারও ফুরসৎ পায়নি।

তখন সে ১৪। তার কোন বন্ধু ছিল না। পাশে দাঁড়াবার কেউ ছিল না। মা ছিল। সে যা পারে তাই করেছিল—রাতভর শাপশাপান্ত।

কাজটা তাকেই করতে হলো, একা একা। পরদিন ভোর রাতে আফিক যখন ময়দানে উঁবু হয়ে, পেছন থেকে একখানা আদ্লা ইট। ব্যস, দীলখুশ খতম।

লোকটা যে মরে যাবে তা ভাবেনি। গা ঢাকা দিয়ে রইল কদিন। তার নামটাও উঠেছিল। কিন্তু বিশেষ পাত্তা দেয়নি কেউ।

তারপর কতরকম কাজ করেছে। কিন্তু পাকাপাকি কিছুই জোটেনি। শহরের ইলেক্‌শনে একবার তাদের ওয়ার্ড কমিশনারের হয়ে খুব খেটেছিল। সে বলেছিল, 'ইলেক্‌শন চুকে যাক। গতি তোর একটা করে দেবই।' গতি অবশ্য একটা হয়েছিল। বগল মাইক আর চার, না তিন, ক হাজার যেন টাকা চুরির দায়ে চার মাস ফাটক ঘুরে আসতে হলো।

ফিরে এল দাগী হয়ে। কর আর না-ই কর, এলাকায় কিছু হলেই পুলিশ তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে। লোকজন তোমাকে দেখলে জিনিষপত্র সামলাবে, আর 'দাদারা' নাক সিঁট্‌কোবে। ছিঁচকে চোরকে কেউ পোঁচে না। পালপার্বনে যে নিয়ম করে 'অ্যান্টি-সোশাল' ধরা হয়—পুলিশ যাকে 'রুটিন অ্যারেস্ট' বলে, তারা যাকে বলে 'ইন্নুয়াল' অর্থাৎ এ্যান্নুয়াল লীভ—সে-লিস্টি করা হয় দাদাদের মতামত নিয়েই। দাদা হেঁকে বলে দেয়, 'এ হানিফ, তোর ইন্নুয়াল লীভের ডাক এসেচে। কাল চলে যাবি।' রাজ্যের ছিঁচ্‌কেরা দল বেঁধে ইন্নুয়াল লীভ খাটতে যায়।

না গেলে? পুলিশ ধুন্‌বে, দাদারা ধুন্‌বে, তারপর এলাকা ছাড়া করে দেবে। তাই যেতে হয়।

একসময় ছিঁচকের নাম ঘুচেছিল বিল্লুর দলে ঠাঁই পাওয়ার সুবাদে। তারপর তরতর করে উঠে যাওয়া। কিছু নামডাক তারও জুটেছে। বিল্লুর খুব পেয়ারের লোক সে এখন। পোর্ট এলাকার ডি-সিও তাকে খাতির করে।

এর মধ্যে সাদেক মারা গেল আনোয়ারের দলের হাতে। তারা অবশ্য ছ-ঘন্টার ভেতরই বদলা নিয়েছিল। কিন্তু যে গেলই সে গেলই। খবরটা সে-ই দিতে গিয়েছিল নছিবনকে। গিয়েই আট্‌কা পড়ে গেল।

তার সোয়ামি তখন ক্যান্সারে ধুঁকছে। গলায় পচন ধরেছে। পচা চিম্‌সে গন্ধে ঘরের ভেতর থাকা দায়। সে-ও থাকতে পারেনি। কিন্তু বেরিয়েও আসতে পারেনি। যে মাংসে পচন ধরেনি, তার একটা ভিন্ন গন্ধ আছে, ভিন্ন স্বাদ।

এবং, মদের চেয়েও কড়া নেশা। সে-নেশার টানে ছুটে ছুটে আসা। তাকে পেয়ে নছিবন পায়ের তলায় জমিন পেল যেন। শুধু টাকা-পয়সা নয়, একটা জোয়ান মরদের ছায়া দরকার ছিল তার। বস্তি জুড়ে ছিঁচ্‌কে তো কিছু কম নেই। তাদের উৎপাত বন্ধ হয়ে গেল ম্যাজিকের মত। একদিন বিল্লুও ঘুরে গেল। এজমালি উঠোনে বসে, সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে 'ভাবী' বলে ডেকে গেল।

এখন বড় সুদিন তার, নছিবনের। দোকানি হাসি মুখ করে ধার দেয়। বাড়িভাড়া বাকি পড়লেও বাড়িওলার তোলাদার তাগাদা দেয় না। শালা তিলিয়া খচ্চর। বাড়িভাড়া তোলার নাম করে সময় নেই, অসময় নেই, ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ত।

হানিফ না এলে হয়তো এই খচ্চরটার সঙ্গেই শুতে হতো তাকে।

ভাবতেই উল্‌টি আসে। গা ভর্তি লোম লোকটার। একদিন জাপটে ধরেছিল। চুমু খেয়েছিল। মুখ নয়, যেন নর্দমা। কি গন্ধ, কি গন্ধ!

আর হানিফ? সা-জোয়ান, ইয়া সিনা—যখন বুকের ভেতর টেনে নেয়—আহ্! অই যে, ঘরের মধ্যে গলায় ঘা নিয়ে পড়ে আছে যে হারামিটা, মরার নাম নেই, সে-ও তাকে কখনও এত সুখ দিতে পারেনি। হানিফের দেখা না পেলে এ-জিন্দেগীতে বোঝাই হতো না মরদ কাকে বলে।

আর কি দীল! গুণেগেঁথে কখনও দেয় না। পাছাপকেটে হাত চালিয়ে যা উঠল, পুরোটাই ধরে দেয়। তুই কখনও দশ পয়সা দিয়েও দেখেছিস নাকি রে হারামি? তোর গলা পচবে না তো কার পচবে!

তবে হানিফকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না নছিবন। কি যে ওর মতলব কে জানে। হঠাৎ করে তোমার বলার কি ঠেকা পড়ল আজ যে কাল এসে লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। ইলাজ না করালে তোমার মান-ইজ্জৎ থাকছে না। কেন? লোকটা সেরে উঠলে তুমি আর এ-ঘরে পা রাখতে পারবে? তবে? আমাকে আর মনে ধরছে না, নাকি? আর কোন মাল পেয়েছ?

এ-সব মনে হতেই কেঁদেকেটে নদী নছিবন। সে জানে, এ-নদীতে ঝাঁপান না কাটার মত মরদ অন্তত হানিফ নয়।

একটু টুস্‌কি দিতেই হানিফের বুকে ছলাৎ ছলাৎ!

বুধ্‌নার চায়ের দোকানে যখন পৌঁছল হানিফ, তখন সন্ধ্যা ঝেঁপে এসেছে। কেউ পৌঁছয়নি তখন। ঠেক ফাঁকা। অথচ এর মধ্যে এসে পড়ার কথা সবার। জরুরী কাজ হাতে রয়েছে।

বেঞ্চে বসে হাঁক পাড়ে,—চা লাগা।

বুধ্‌না উনুনের ওপর থেকে খুব আলস্য ভরে কেট্‌লিখানা তুলে নেয়।

তখ‌ই পোস্টারখানার ওপর নজর পড়ে তার। আঁঠা এখনও কাঁচা, সবে লাগানো হয়েছে। বেশ রঙচঙে। ডান পাশে একটা মন্দিরের ছবি, বাঁ পাশে লেখা রাম-মন্দির। তার তলায় ছোট হরফে লেখা 'অযোধ্যা'।

'কারা মারল রে?'—খানিকটা কৌতুক নিয়েই জিগ্‌গেশ করে।

বুধ্‌না উঠে এসে নীরবে চায়ের গ্লাস নামিয়ে রাখে টেবিলে। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

'কি রে?'—গ্লাস টেনে নিতে নিতে কথাটা ফিরে বলে আবার।—'রামচন্দ্রের কোন্ চেলারা মারল, আঁ?'

তবু রা কাটে না বুধ্‌না।

হা-হা করে হেসে ওঠে কারা—'মোসলা কাঁহিকা?' দৃশ্যটা মনে পড়তেই তেড়েফুঁড়ে উঠে বসতে চায়—'কাত্‌না, তোর ভুঁড়ি আমি ফাঁসিয়ে দিব একদিন। মায়ীকা কসম! বিল্লু—না, না—'

না, বিল্লুকে কিছু করা যায় না। এ কি দু-এক দিনের দোস্তি! রাতের পর রাত বন্দর এলাকা দাপিয়ে বেড়ানো, জল পুলিশের সঙ্গে এন্‌কাউন্টার—আনোয়ার—ফুঃ, কুত্তিকা বাচ্চা!

একে—তাকে দিয়ে কম টুইয়েছে নাকি তাকে, আনোয়ার, শালা পুলিশের পা-চাটা কুত্তা! দলে এলে পঁচাশ পঁচাশ হিস্‌সা। বিল্লুকে বিলা করে দিয়ে এলে পঁচাশ হাজার, নগ্‌দানগ্‌দি।

আহ্‌, আহ্‌! মেঝে খিঁমচে ধরে, বিকারের রোগীর মত মাথা ঠুকতে থাকে।

সেই আনোয়ারেরও এত বড় বুকের পাটা হয় নি যে বলে, আমিও মুসলমান, তুমিও মুসলমান, তো—

'বিল্লু'—প্রবল আক্রোশে ঝনঝন করে বাজতে থাকে তার কণ্ঠ—'বিল্লু তোকে আমি—না, না, দোস্ত হা খোদা!'

জীবনে সেই প্রথম তার মুখে খোদার নাম শোনা গিয়েছিল।

চারদিন বাদে, তখনও তার আচ্ছন্নতা কাটেনি, খুটখুট করে কে যেন দরজার কড়া নেড়েছিল। আর ভীত সন্ত্রস্ত গলায় ডেকেছিল, 'দরজা খোল, এই—দরজা খোল এই—'

কে?

দরজা খোল।

কে?

দরজা খোল।

কে, নাছোড়বান্দার মতই ডেকেই যায়। শেষ পর্যন্ত উঠতেই হয়। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে সে। অন্ধকারে ঠিক চিনে উঠতে পারে না। নছিবন?

কে?

আমাকে চিনতে পারলে না!

কি চাস?

তোমার অসুখ?—বলে সে বসে পড়ে।

কেন?

বেরোও না, দরজা খোল না—

রাত কত রে এখন?

অনেক। প্রায় বারটা। খদ্দের চলে গেল, দরজায় তালা দিয়ে চলে এলাম। কি হয়েছে গো তোমার?

উঁ?—হেনা, তুই তো হিন্দু, না?

হ্যাঁ, হিন্দুই তো। আমার ঘরে কত ঠাউরদেবতার ছবি রয়েছে দেখ নি!

তুই জানিস, আমি মুসলমান?

অমা, তা জানব না কেন!

তাহলে—

কি, তাহলে?

না, কিছু না। বল—

তোমার সঙ্গে নাকি বিললুর—সবাই বলাবলি করছে।

কি বলছে?

তোমাদের নাকি কাটাকাটি হয়ে গেছে?

ছেড়ে দে ও-সব কথা। কিছু খাওয়াবি?

কি খাবে বল?

অনেক কামিয়েছিস আজ মনে হচ্ছে?

তালে ? ছ জন খদ্দের পেয়েছি আজ।

সবাই হিন্দু ?

কি হয়েছে গো তোমার ? তোমারে তো ধম্মো নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি কখনও।

না রে, কিছু হয়নি। কদিন একটু আয়েশ করলাম। মাথাখান জ্যাম হয়ে আছে।

কি খাবে ?

নিয়ে আয় না যা খুশি তোর।

মাল ?

তার ঠোঁটে আলতো করে হাত বুলোয় হানিফ, বলে, 'তুই আমার আগের জম্মের বউ ছিলি য্যান মনে হয়।'

বেরিয়ে যেতে যেতে হেনা বলে যায়, 'যদি মন করে এ-জম্মেরও হতে পারি।'

ক-দিন পর নছিবনের কাছে গেল হানিফ। তার কাছে হাজার কয়েক টাকা রাখতে দিয়েছিল। টাকার বড় দরকার এখন। আয় বসে গেছে একদম। ধার-বাকি বন্ধ হয়ে এল বলে। সকলেই জেনে গেছে, না সে বিল্টুর দলে আছে, না তার আছে কোন দল। ফলে তাকে আর এখন সমঝে চলার কিছু নেই। যা হয় আর কি।

এ নিয়ে সে ভাবে না। এত বড় বন্দর এলাকায় সে আর কিছু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না চিরকাল। ধাক্কাটা সামলে ওঠার জন্যে কিছু সময় দরকার। আর কিছু টাকা। নছিবনের কাছে গচ্ছিত টাকাটায় এখন কাজ দেবে। তার ও-সব জমানো-টমানোর কোন গা ছিল না। নছিবনই ধরে-বেঁধে করিয়েছে যা করার।

নছিবনকে নিজের বউ বলেই মনে হয় এখন। লোকটা আর কতদিনই

বা বাঁচবে। নছিকে নিকে করে ঘরে তুলবে তখন। এই সময় হেনার কথা মনে পড়ে। ও-রকম একজন বাজারে মাগীর সঙ্গে রাত কাটানো যায়। তা বলে তাকে শাদি! তা ছাড়া, সে হলো গে হিন্দু। জান থাকতে সে আর হিন্দুদের সঙ্গে কোন কাম-কারবারে যাচ্ছে না।

কোথায় যেন এক মসজিদ ভেঙে হিন্দুরা সেখানে নাকি এক মন্দির বানাতে যাচ্ছে। এ নিয়ে নাকি দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে। যদি বাঁধে তো নসিব ফিরিয়ে ফেলতে হবে। প্রথম চোটেই হিন্দুদের খানকয়েক দোকান ফরসা করে দিতে পারলেই হলো। তারপর বিল্লু —তোকে সমঝে দেব কে কত মায়ের দুধ খেয়েছে। এ-দেশের বাদশা কে ছিল রে, শালা? তোরা, না, আমরা? বাদ্‌শার জাতের সঙ্গে টোক্কর নিতে আসিস, বেটা কাফের!

গতকাল রাতে তাদের মহল্লার মসজিদে এক জমায়েত হয়েছিল। সে গিয়েছিল সেখানে। হয়তো নিজের গরজে যায়নি, বস্তির লোকজনের পীড়াপীড়িতেই গিয়েছিল। খুব যে একটা সাধাসাধি করতে হয়েছিল তা নয়। নিজের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ের পালা এখন তার। মনে মনে হয়তো শিকড় খুঁজছিল সে। তবু যাবার আগে হেনাকে সাবধানে থাকতে বলে গিয়েছিল। মেয়েটার ওপর মায়া পড়ে গেছে বড়।

হানিফ আগে কখনও মসজিদে যায়নি। ভেতরটা বড় ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। চওড়া চওড়া থাম, ধনুকের মত বাঁকানো খিলান, বিশাল গম্বুজ আর জাফরির কাজ দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এক এক করে লোক এল অনেক। নমাজ পড়ার জায়গাটা ভরে গেল। তারপর এলেন বড় মসজিদের ইমাম, তার সঙ্গে আরও সব ভারি ভারি লোকজন। কি সুন্দর চেহারা সব! মেহেন্দিমাজা দাড়ি, গোলাপ ফুলের মত গায়ের রং, বাহারি কুর্তা। আর কি ভরাট গলা, যেন মুয়াজ্জিমের হাঁক—

হঠাৎ খেয়াল হয়, নছিবনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে। দরজা

বন্ধ। ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। ভর দুপুরে মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে—ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই রক্তের চাপ বেড়ে যায়। কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকে, নছিবিবি—

কেউ সাড়া দেয় না।

বার কয়েক ডাকার পর দরজা খুলে যায়। যা ভেবেছিল তাই। বিবি তার আদুল গায়ে, শাড়িটা কোন রকমে জড়িয়ে উঠে এসেছে।

সে এগোতেই দরজার পাল্লায় দুহাত ছড়িয়ে নছিবন কেমন যেন রুক্ষ গলায় বলে, কি বলবে বল।

বলব আবার কি।—হানিফ চোখ মটকায়।—তোর কি এখনও ঘুমের ঝোঁক কাটে নি। ভাল করে তাকিয়ে দেখ। আমি রে—

আমার এখন সময় নাই। পরে এস।—বলে, পাল্লা ভেজিয়ে দিতে চায় নছিবন।

সময় নাই মানে! করছিসটা কি?

নছিবন হাই তোলে। তুড়ি বাজায়। কথাগুলো বাতাসে জড়িয়ে যায় যেন, ঘরে নোক আছে।'

'নোক মানে!'

'নোক মানে নোক। যাবে, না ডাকব।'

'মাগী তোর এতবড় আস্পদ্দা—'

হয়তো এক পা এগিয়েছিলও। নছিবন পিছিয়ে গিয়ে অন্ধকার ঘরে কাকে যেন খোঁজে। তারপর বলে, 'দেখ না, লোকটা কেমন করছে।' অন্ধকারের ভেতর থেকে সে বেরিয়ে আসে। শর্ট প্যাণ্ট পরা লোকটিকে চিনতে পারে হানিফ। মুকবুল—আনোয়ারের দলের ছেলে।

মুকবুল তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে। হাসতেই থাকে।

হানিফ চিৎকার করে ওঠে. এ নছিবন, রেণ্ডিমাগী শালী, রুপেয়া ফেক।'

নছিবন ঝংকার দিয়ে ওঠে, 'আ-হা-হা, রুপেয়া ফেক'!

'কিসের টাকা! ও টাকা গায়ে গায়ে শোধ হয়ে গেছে। তখন মনে ছিল না। দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, সন্দে নেই—নিকে করা বউ পেয়েছিলে, শালা। সব মিনিমাগুনায়, এঁ্যা! ব-ব-ব-ব!'

মুকবুল হেসে ওঠে।

'তোকে আমি খুন করব রে শালী!'

'আয় না বাঞ্চৎ আয়। দেখি, কত বড় মুরোদ তোর। আয়।'

'আ বিবিজান, অন্দর যাও।'—মুকবুলের কণ্ঠ আদরে যেন গলে যেতে থাকে।

'নাত্থি তোর মুখে, নাত্থি।'—পা তুলে ক্রমাগত মাটিতে ঠুকতে থাকে নছিবন।—'তোর আর কি আছে রে শালা। বিল্লু তো ঘাড় ধরে বিদায় করে দিয়েছে। এখন তো ফ্যা-ফ্যা। তোর মত নোককে আমি বাঁ পা দিয়েও ছুঁয়ে দেখিনে রে বাঞ্চৎ'—

ঘরে ফিরে এল সন্ধের মুখে। বস্তির বাতাস তখন ধোঁয়ায় ভারি। মাথার ভেতরটা দাউদাউ। ভয়ঙ্কর কিছু একটা করতে চাইছিল সে। একটা খুন না করা পর্যন্ত এ-দাহ কমবার নয়। নছিবনকে কি করে পায়। রিভলবারটা যদি থাকত—'বিল্লু, তোর নলি ফাঁক করে দেব, জেনে রাখ, হারামির বাচ্চা।'

এই সময়ই চোখে পড়ল, হেনা সেজেগুজে বাইরে বেরুচ্ছে খদ্দেরের খোঁজে। সে সামনে গিয়ে বলে, 'আমার ঘরে আয়।' হেনা কোন কথা বলে না। তার পেছন পেছন ঘরে গিয়ে উঠল।

'বোস।' বলে, ড্রাইসেল ব্যাটারির ইমার্জেন্সি লাইটের সুইচ টিপে দিল। খাঁটি চাইনিজ, পোর্টের মাল।

কোমল আলোয় ঘর ভরে যায়।

'বল।'—হেনা গুছিয়ে বসতে বসতে বলে। হঠাৎ হানিফের চোখে নজর পড়তেই আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'তুমি' কি—খুন করে এসেছ ?'

হানিফ মাথা নাড়ে। শার্টখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডাকে, 'আয়।'

'দাঁড়াও, শাড়িটা খুলে নিই। পাট ভেঙে যাবে। এটা দিয়েই হপ্তাভর চালাতে হবে।'

হানিফ হাসে, মনে মনে।

সব কিছু খুলে সে যখন কাছে এল, হানিফ কেমন যেন আড়ষ্ট তখন। হাতখানা টেনে নিয়ে বুকের ওপর রাখে হেনা। হাতখানা কি কেঁপে উঠল ?

হানিফের তেষ্টা পায়। বিলিতি জাগ থেকে কাট-গ্লাসে জল এনে তার সামনে বাড়িয়ে ধরে হেনা। দু চুমুক খেয়ে বাকিটা মাথায় থাবড়ে থাবড়ে বসিয়ে দিতে থাকে হানিফ।

'তোমার কষ্ট হচ্ছে ? মাথা টিপে দি ?'—হেনা ঝুঁকে আসে।

হানিফ চোখ বুজে শুয়ে পড়ে। মাথায় কপালে খেলে বেড়ায় শীর্ণ হিমশীতল কিছু আঙুল। হেনা কি পেটভরে খেতে পায় না ? এত ঠাণ্ডা কেন আঙুলগুলো !

'তোর কত রোজগার রে, মাসে ?'—চোখ বুজেই প্রশ্ন করে।

'এক কথায় কি বলা যায়। একেক মাসে একেক রকম।'

'পেট ভরে—সবদিন ?'

হেনা চুপ করে থাকে।

'কি রে ?'

আঙুল থেমে যায়। তারপর, যেন বা দুঃসহ লজ্জায়, হানিফের বুকে মুখ গুঁজে দেয় সেই বহুভোগ্যা রমণী।

এক ডালি চুলে হাত ডুবিয়ে রেখে আনমনা হয়ে যায় হানিফ। এই তো সেদিনও খোলামকুচির মত দুহাতে টাকা উড়িয়েছে। ডক

এলাকায় টাকা ওড়ে। ধরতে জানার বিদ্যেটা চাই। তা ছিল তার মুঠোর মধ্যে—ছিল। আর আজ? মাত্র কয়েকটা সপ্তাহের মধ্যেই ডক্‌কা রাজা ফকির বন গিয়া।

সে-সব দিনে কেন জানতে দিস নি তোর পেট ভরে না? কত খেতিস, কত? তোকে রাণী করে দিতে পারতাম। নোটে নোটে ভরে দিতে পারতাম দুহাত, রোজ। আজ আমি ফকির যখন, তখন কেন—কেন বুকের ভেতর মুখ গুঁজে তোর এই পড়ে থাকা?

খুব আদর করতে ইচ্ছে হয়। হেনার শরীরের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে তার হাত। ঘাড় বেয়ে তা নেমে আসে গলায়। গলার কাছটায় কি যেন ধুকপুক করছে। প্রাণ কি তবে এখানটায়? তলপেটে নয়—যা ফাঁসিয়ে দিলেই?

শ্বাসনালির ঠিক ওপর তার বুড়ো আঙুল থেমে আছে এখন। আস্তে আস্তে চাপ দিতে থাকে। হেনার গলা থেকে আওয়াজ ওঠে—সুখের, তৃপ্তির। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে গলার ঠিক নিচে চাপ দিতে থাকে। ভেতরে ভেতরে কাঁপতে থাকে হানিফ আর একটু, আর একটু—

'জানো'—মনে হয় যেন অনেক দূর থেকে কথা গুলো ভেসে আসছে—'আমাকে ঘর থেকে বের করে এনেছিল যে সে ছিল হিন্দু। যার কাছে আমাকে বেচে দিয়ে সে পালিয়ে যায়, সে ছিল মুসলমান। লোকটার ছিল বুকের ব্যামো। তিন মাস না পেরতেই বুক ফেটে মরে গেল একদিন। লোকটা বেঁচে থাকলে আমি হয়তো ছেলের মা হতে পারতাম। বড় ভাল মানুষ ছিল। ধর্ম দিয়ে মানুষকে বোঝা যায় না। তুমিও তো মুসলমান। কিন্তু কত ভাল মানুষ তুমি। সেই লোকটার মতই'—

হাত থেমে যায়।

'তোমার খুব কষ্ট, না?'

'কে বললো?'

'বোঝা যায়। তুমি একটা নতুন দল কর না কেন?'

হানিফ হাসে।

'হাসছো কেন?'

'ইচ্ছে করলেই দল করা যায়? থানা পুলিশ পলিটিক্যাল মদত—কত কিছু চাই। তারপর আর্মস চাই।'

'সে-সব তো তোমার জানাই আছে। তোমার এই ঘরেই তো থানার বাবুরা মাল খেয়ে গেছে কতদিন।'

থানা যে এখন তার হাতছাড়া, তা স্বীকার করতে অহমিকায় বাঁধে। ফলে অন্য কথা বলে—'হাঁ, তা ঠিক, থানাপুলিশ নিয়ে ভাবি না। কিন্তু টাকা ছাড়া তো দল গড়া যায় না, হেনাবিবি।'

'কত টাকা?'—এমন করে বলল যেন আঁচল থেকে চাবিটা নেয়ার অপেক্ষা।

'অনেক।'

'কত?'

জানে, কোন মানেই হয় না এসবের, তবু বলে, 'এই ধর, পঁচিশ-ত্রিশ হাজার।'

কতক্ষণ আর কোন কথা শোনা যায় না। রোজ সন্ধে বেলা সেজেগুজে যাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়, তার কাছে সংখ্যাটার কোন মানেই হয় না হয়তো। তার নিজের কানেই কেমন খাপছাড়া শোনালো।

বুকের ওপর আঁকিবুকি কাটতে থাকে হেনা। অনেকক্ষণ পরে বলে, সঙ্কোচে গলা বুজে বুজে আসে তার, 'আমাকে নাকি পাঁচ হাজার দিয়ে কিনেছিল লোকটা। অনেক দিন আগের কথা অবশ্য। অনেকটা বুড়িয়ে গেছি। আমাকে এখন আর ও-দামেও বোধহয় কেউ কিনবে না, না?'

'কি বলিস!'—হানিফ উঠে বসে। তার কোলের ওপর গড়িয়ে পড়ে হেনা। আবেশে চোখ বুজে আসে।

'না, বলছিলাম—আর একটু যদি সুরত থাকত আমার, একটু মাংস, তা হলে আমাকে বেচে দল গড়ার পুরো টাকাটাই হয়তো পেয়ে যেতে। জীবনে কারো কোন কাজে এলাম না—না নিজের, না পরের। বড় কষ্ট গো আমার।'—ঝর্‌ঝর করে কেঁদে ফেলে।

হানিফ স্তব্ধ হয়ে যায়। কোলের ওপর ফুলে ফুলে ওঠে পল্‌কা একটি শরীর।

বড় মায়া হয়। বড় আপন বলে মনে হয়।

ধীরে ধীরে তাকে তোলে। চোখের জল মুছিয়ে দেয়। কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিশফিশ করে বলে, 'নিজেকে বেচে দিলাম তোর কাছে।'

'মিনিমাঙ্‌নায়?'

'তুইই বল।'

তার গলা জড়িয়ে ধরে হেনা। মুখ নেমে আসে।

ঠোঁট তুলে নিলে হানিফ বলে, 'জানিস, তোকে খুন করব ভেবেছিলাম।'

'জানি।'—বলে, সে হাসে। তারপর হানিফের কাঁধে মুখ ডুবিয়ে দেয়। □

গোবিন্দরঞ্জন রায়

প্রসূতি

এখন হেমন্তকাল। সূর্য মাঝ আকাশে উঠেও আজকাল তাপ ছড়াতে পারে না। রোদের রঙ ইদানিং সোনা হয়ে এসেছে। আলবন্দী সব মাঠে অঘ্রানের উপচে-পড়া যৌবন খাসা গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। শুধু যত শীত নেমেছে কাংলু মণ্ডলের ঘরণী বাউলীর মনে। কার্তিক মাসে সবুজ ধানের পেট টিপে দিলে যেমন সাদা রস বেরিয়ে আসে তেমনই অঢেল দুধ এখনও মজুত আছে বাউলীর ঠাসা বুক দুটোয়। ষোলো বছরের কুমারী শরীরের মতো ওর মিহি কোমরের নিচে এখনও সুঠাম জঙ্ঘা আর পা দুটো যেন বিচি-কলা গাছের গুঁড়ি। চারিদিকে এত ফসলের সমারোহের মধ্যে বাউলী এক অনাবাদী মাঠ। দশমাস দশদিন অন্তর শষ্যবতী হওয়ার ক্ষমতা ওর না-মরদ স্বামী কাংলু, মাত্র দুশো টাকায় বেচে এসেছিল হরিশচন্দ্রপুর সরকারি হাসপাতালে। তখনো বাউলীর দুটো সবুজ ফসল—কানাই আর বেনুগোপাল। মোরগ-মায়ের মতো ওই কুচো দুটোকে নিয়ে বাউলী মনের সুখে মাঠে ঘাটে ঘুরতো। কাস্তে দিয়ে গৃহস্থের ধান কাটতো আর ওরা দুজন জমিতে পড়ে থাকা শিষগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে জমা করে রাখতো আলের ওপর। সেবার বান আসার দিন পনেরো পরে ক্ষেত-ভুঁই সড়কের ওপর থেকে জল সরে গেলে মাঠে মাঠে প্রচুর পলি পড়েছিল। গাঁয়ের বুড়োথুড়ো, প্রাচীন মানুষেরা তাদের অভিজ্ঞতার জরিপে মেপে বলেছিল—এবার নাকি মা বসুন্ধরার বুকে সোনা ফলবে। সত্যিসত্যি ফসলের জোয়ার এসেছিল সেবার, আর সাথে এসেছিল ওলাবিবি, বাহনের পিঠে চেপে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি বাড়ি টিকা আর ব্যাগ ভর্তি পিল মুঠো মুঠো বিলিয়েও ওলাবিবিকে তাড়াতে পারেনি। বানের জলে ভেসে-আসা

চিতল মাছের পেটি দিয়ে ভাতটাত খেয়ে দুই ভাই কানাই আর বেনু-গোপাল সেদিন ছাগল তিনটিকে ইস্‌কুলের মাঠে বেঁধে দিতে গেল, কেননা আর কোথাও ঘাস ছিল না। সেই মাঠেই ওদের একসাথে দুজনের ভেদবমি শুরু হয়েছিল। মাছ ধোয়া জলের মতো দাস্ত হতে হতে বেনুগোপাল মাঠেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর কানাই কোনরকমে বাড়িতে এসে বাউলীকে বলেছিল—ইস্‌কুলের মাঠৎ বেনুয়া মরে গেলে, মাগে তুই দৌড়ে যা। বেনুগোপালের নিথর দেহটা বাড়িতে বয়ে আনতে আনতে কানাইয়ের দেহও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তখন। ভাবতে ভাবতে বাউলীর চোখ ভিজে এলে সম্বিত ফিরে পেয়ে এঁড়ে বাছুরটিকে বাগানের আম গাছের নিচু ডালে বেঁধে দিল। আশে-পাশের গরুগুলোর কাছে গিয়ে গোবরের নাদ্‌ কুড়িয়ে নিয়ে ডালি মাথায় বাড়ি ফিরলো। কাংলু তখন দাওয়ায় বসে সুতো আর মাকু নিয়ে নিবিষ্ট মনে জাল বুনছে। বাউলীকে এক পলক দেখে নিয়ে বিড়-বিড় করলো—মাগীর গতর য্যানে দশমন ভারি। জলদি করে চলবা পারেনি। বাউলীও ফুঁসে উঠলো—তুই কুন্‌ কাম করিছিস? আড়িয়াটাক্‌ মাঠৎ চরাবা পারিস নি?

—দেখ্‌বা পাসনি জাল বুনিছি। সাত হাত জিভা বার করে মাছ খাবি ক্যাম্‌নে?

—রাতের বেলা জাল বুনলে হবে নি? কত্ত কামের মরদ হামার। বাউলীর গলা রোখ-চাপা।

—কুপির আলোৎ মুই দেখবা পাছি নি। নিস্পৃহভাবে কাংলু বলে। বাউলীর মনে হলো তার এই বুড়ো স্বামীর বয়েস তিনকুড়ি পেরিয়ে গেল, তবু রক্তের তেজ কমেনি। কথায় কথায় গালমন্দ পাড়ে। বাউলীর সাথে যখন বিয়ে হয়েছিল, কাংলুর সংসারে তখন লক্ষ্মীর আবাস। বিঘে-তিন জমি ভাগচাষ করতো মুকুন্দর বাপের। গোয়ালে একটি গাভিন গরু, দুটো বলদ। নিজের লাঙলও ছিল। এইসব

দেখে শুনে বাউলীর মা-বাপ মেয়েকে ঘর করতে পাঠিয়েছিল প্রায় দ্বিগুণ বয়েসী এই মানুষটির ঘরে। মুকুন্দ ঘোষের বাপ সুবল ঘোষ তার আম বাগানের লাগোয়া তিন বিঘে জমি কাংলুকে ভাগচাষ করতে দিয়ে নাকি বলেছিল—মনে করিস এইট জমি তোর নিজের জমি। মনের সুখে তুই চাষ করবা পারিস। আর আমের সময় বাগান পাহারা দিস। মুই আসে—ফসল বেচা ট্যাকা আর আম লিয়ে যামু। সিকিভাগ আম তোকে খাবা দিমু। এই বলে বুড়ো মালদহ শহরে চলে গিয়েছিল। জেলা-আদালতের সামনে ওর ছিল চায়ের দোকান। মুকুন্দর মা মারা যাওয়ার পর সেই বুড়ো আবার শহরে এক বিয়ে করেছিল। দুই পুরুষ ধরে ওদের সাথে কাংলুর পরিবারের সখ্যতা। মুকুন্দর বাপ মারা যাওয়ার আগে ঐ আমবাগান আর লাগোয়া জমিটা মুকুন্দর নামে উইল করে গিয়েছিল। মুকুন্দও বাপের মতো কাংলুর কাছ থেকে বছরের ফসল নিতে আসতো শহর থেকে। মাস ছয়েক হলো মুকুন্দ গ্রামে ফিরে এসে আরো জমিজিরেত কিনে গৃহস্থ হয়েছে। শহরের চায়ের দোকানে নাকি তার সৎমায়ের ভায়েরা দখল নিয়ে বসেছে। ওতে মুকুন্দর আর হক্ নেই। আমবাগানের লাগোয়া জমিতে গ্রামে এসেই মুকুন্দ আমের চারাগাছ লাগিয়েছে। গাছ-টাছ লাগানোর পর বাউলীদের উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল—কাংলুদা গে মোর জমিটৎ আমগাছ লাগাই দিমু। গাছ বড় হলে তুমিও ফল খাবেন। মুইও খামু। বাউলী কথাটা শুনেই চমকে উঠেছিল, গলায় উষ্মা মিশিয়ে বলেছিল—তুমার জমি তুমি গাছ লাগাবেন হক্ কথা। কিন্তু এ্যাতদিন তুমার দাদা চাষ করিছে, একবার আগে কহবা হত নি মোড়ল ?

—তু চুপ কর্ না মাগী। কথার ভিত্‌রি ফড়ফড় করিস। এরপর নিচু গলায় কাংলু মুকুন্দকে বলেছিল—তা করেছেন ভালো। আমের ফলৎ পয়সা হবে। বেশ, বেশ। হেসে মাথা নিচু করে মুকুন্দ

বলেছিল—যত্দিন গাছগিলা মানুষ না হয় ভোগ দখল করবেন।

মুকুন্দ চলে গেলে কাংলু বউকে বলেছিল—তুই জমিজমার কী বুঝিস কহদিনি? আগে থেকে জানায় দিলে মুইতো জমিৎ বর্গা করবাও পারি। এখন গাছ লাগাই দিবার পর মুই আর কিছু করবা পারমু নি। ফলের বাগান বর্গা না হয়। বাউলী মনে মনে সেদিন মুকুন্দর বুদ্ধির তারিফ না করে পারেনি। তারপর যতদিন গেছে, যত সে মুকুন্দকে দেখেছে ততই ওর বুদ্ধিবিবেচনা দেখে বাউলী অবাক হয় আর ওকে ভালো লাগে।

—আঙনাত্ দাঁড়ায় এত কী ভাবিছিস কহ? জাগে জাগে স্বপন দেখিছিস মনে লয়? ভাতটাত রাঁধবা হবে কি হবে নি? জাল বোনা থামিয়ে মাকু হাতে কাংলু হাঁকার দেয়।

বাউলী ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এসে গৃহস্থালীর কাজে হাত লাগায়।

(২)

পঞ্চায়েতের পুকুর থেকে স্নান সেরে মাটির কলসিতে দেবেন মণ্ডলের বাড়ি থেকে টিউকলের জল নিয়ে আমবাগানের ভেতর দিয়ে বাউলী বাড়ি ফিরছিল। মুকুন্দকে দেখে ধক্ করে ওর চোখদুটো কেঁপে গেল, একটা উত্তাপের হলকা তলপেটে সেঁধিয়ে গেল। মুকুন্দ জমিতে দাঁড়িয়ে নতুন লাগানো চারাগাছ গুলো দেখছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় বাউলী বললো—কী এত দেখিছেন মোড়ল। কলমগাছে কি আম পাকিছ্যা?

—কী কহমু আর কহেন বৌদি। মানুষের আকিকলটা দেখিছেন? জমির ভিত্রি দিয়ে সব গাইগরু লিয়ে যাছে। চার-চারটা ফজলি আমের গাছ মাটি থিকে গরুতে আগলে দিছে।

বাউলীর মনে কুচিকুচি সুখ তখনি ওম ছড়ায়। ওর মনে হয় বেশ হয়েছে।

অন্যায়ভাবে ভাগের চাষক্ষেতির জমিতে বাগান করার এই ফল। আকাশের দেবতা গিলিন সব দেখিছে। গায়ের কাপড় ঠিক করে সে হাঁটা দিল। মুকুন্দ পেছন থেকে ডাকে—এট্টু জল খাবা দিবেন বৌদি? পিয়াসে গলা ফাটে যায়।

বাউলী মুচকি হেসে চোখের কোণে বাতি জ্বালিয়ে বললো—খালি জল দিবা না হয়। বাড়িৎ আসেন। এটুক গুড়ের সাথ্ জল খায়ে যাবেন। বাড়িতে এসে কলসি নামিয়ে রেখে সে মুকুন্দকে পিঁড়ি পেতে বসতে দেয়। ঘর থেকে কাগজে করে গুড় আর জল এনে তার সামনে নামিয়ে রেখে দিয়ে ভেজা কাপড় বদলাতে যায়।

—দাদাকে নি দেখিছি। কুনঠে গেলছে বৌদি? বাউলী ফিরে এলে মুকুন্দ এদিক ওদিক তাকায়।

—তুমার দাদা তিনদিন পর আজকা পাইট দিবা গেলে। উ মরদ কোদাল ঝাড়বা, ভার বহবা পারেনি। খালি জমিৎ হাল দিবা পারে।

—বুড়্হা বয়সৎ কত্ত আর কাম করবে কহেন?

—উ নিজে পয়সা কামাবা পারবে নি, হামাকেও পাইট দিবা যাবা দেয় নি।

—দাদার মনৎ চিন্তা লিছে পাইট দিলে তুমার লরম হাতগিলা শুকায় শক্ত হয়ে যাবা পারে। মুকুন্দ শব্দ করে হেসে উঠলো।

—উতো একটু নি-মরদ। দিনের বেলা হামাকে খালি গাল দিবে; আর রেতের বেলা হামার শরীলের রক্ত চুষে খাবে।

মুকুন্দর চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠলো। ওর সাথে অনেক এটা-সেটা বলেও এর আগে সে কোনদিন এই নারীটিকে শরীরের প্রসঙ্গে নামিয়ে আনতে পারেনি। আজ নিজে থেকেই মনের গোপন ব্যাথায় রহস্যের দরজা হাট করে খুলে দিচ্ছে যেন।

ইচ্ছে করেই সে একটু খুঁচিয়ে দেয়—কিন্তুক তুমাদের ছেলা পুলা হল

নি ক্যানে বৌদি ?

প্রচণ্ড খরায় ফেটে হা-হয়ে-যাওয়া মাটির বুকে কোদালের কোপ পড়লে যেমন কর্কশ শব্দ হয় যেন তেমনই এক ধাতব আঘাতে বাউলী নীরব হয়ে গেল। তারপর ফুলে ফুলে ফোঁপাতে লাগলো।

—মাত্র দুশো টাকার কনে হাসপাতালৎ লিয়ে গিয়ে তুমার দাদা হামাকে বাঁজা করে দিলছে। ছেলা দুটা বাঁচে থাকলে আমার খাবার ভাবনা হত ?

—তার মানে তুমাক্ অপ্রাশন করিছে ?

মাথা নেড়ে বাউলী তার তলপেটের কাপড় এক ঝটকায় সরিয়ে দেয়। অপারেশনের চিহ্ন দেখিয়ে বলে হামার ইখানটায় ডাক্তার-মড়া কেঁইচি দিয়ে কাটে দিছে। হামার আর কিছু হবে নি।

সেই নির্জন দুপুরে তলপেটের দাগ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়ে মুকুন্দ ওর তপ্ত ঠোঁট নামিয়ে দিল সেই লম্বা দাগের ওপর। এক দমকা হিমেল হাওয়ায় দুজনে কেঁপে ওঠে।

মুকুন্দ এগোতে গেলে বাউলী কাঁপতে কাঁপতে বাধা দেয়—

ইখানে নি, বারাণ্ডায় নি, ঘরে চল মোড়ল। তারপর সে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা অনাবাদী মাঠ হয়ে যায়। মুকুন্দ বৈশাখের ভারি মেঘ হয়ে অঝোরে ঝরে পড়ে নিস্ফলা মাটির ওপরে।

(৩)

দিন দশেক পরে বাছুর বাঁধতে গিয়ে ফের দেখা হয়ে যায় মুকুন্দর সাথে। বাউলী গলায় শ্লেষ মিশিয়ে বলে—কি গে ছ্যাওর, তরকারি কি বাসী হয়ে গেলে ? সেদিন ঠেঙে আর যে তুমার দেখা নাই ?

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে মুকুন্দ নিচু গলায় বলে—কালকা যামু, তুমি হামার মনৎ কুনোদিন বাসী হবা নি।

না না, কাল তুমার দাদা কামৎ যাবে নি। বাড়িৎ বসে হাটৎ বেচবার কনে ঝাঁ্যাটা বানাবে। পরশুকা হাট আছে নি ?
মুকুন্দ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—কুন্ শালার বেজন্মা ছোট্ট আমের গাছ গিলা মারে ফেলাছে। রোজ রোজ তুটা তিনটা করে গাছ মরে যাছে। মনৎ লয় কুনো শালা হামার সাথ্ দুশমনি করিছে।– মুকুন্দর গলা বিষন্ন শোনায়।—তালে লতুন গাছের ফলতো খাবা পারমু নি ?
রসিকতায় মুকুন্দ সাড়া না নিয়ে বলে—ত্থাখনা, আর মাত্র তুইখান গাছ আছে।—সে গভির দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ঐ তুট ল্যাংড়ার গাছ, হাজিপুরী ল্যাংড়া !
বাগানের দিকে চেয়ে বাউলী দেখলো সারা জমিতে যতগুলো গাছ ছিল, তুটো বাদে সবগুলোরই আয়ু শেষ। কোনটার শেকড় আলগানো। কোনটার পাতা শুকিয়ে গেছে। বাউলীর মনের গভিরে ঝিলিক দিয়ে উঠলো সাদা ভুরুর নিচে তুটো ক্রুর চোখ। মাথা নিচু করে এসে কাংলুকে বললো—মুকুন্দর বাগানের সব গাছ সাফ হয়ে গেলে এ্যাতদিন থিকে তুমি জমিন চাষ করিছ, এট্টুক পাহারা দিবা পার নি ?
কাংলু সাথে সাথে গর্জে ওঠে—কাঙালীচরণ কারো চাকর নি বুঝলি। উর আমগাছ মরিছে, তোর কী হয় ? ইঃ শালী পিরিত মারাছে।
রাতের খাওয়া সেরে যখন কাংলু অঘোরে ঘুমোচ্ছে, বাউলীর চোখে তখন ঘুম নেই। মুকুন্দর কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ও বলেছিল কোন লোক মুকুন্দর সাথে তুশমনি করছে। কে যে সেই নির্দয় লোক বাউলী অন্ধকারে নির্ণয় করার চেষ্টা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। শেষ রাত্রে ঘরের মধ্যে কীসের শব্দে বাউলীর ঘুম ভেঙে গেল। মশারির ভেতর থেকে লণ্ঠনের মিয়োনো আলোয় দেখতে পেল কাংলু হাতে একটা খুন্তি আর মশলার তাক থেকে ছোট একটা কৌটো নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর বাউলী

বিছানা ছেড়ে উঠলো। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে সেও বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। হাতে নিয়েছিল বড় একটা হেঁসো। চারিদিক শুনশান অন্ধকার। হেমন্তের অমাবস্যার রাতে ওপরের গাছ থেকে শিশির ঝরে পড়ছে মাথায়। কান অবধি চাদর মুড়ির জন্য বাউলীকে এখন কেউই চিনতে পারবে না। আমবাগানের ভেতর দিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে গেল নতুন জমিটার ল্যাংড়া গাছ দুটোর দিকে। অন্ধকারের সর ক্রমশ আকাশ থেকে সরে আসছে। বাউলী দেখলো একটা কালো মূর্তি মাটিতে উবু হয়ে বসে একটা গাছের গোড়ায় খুঁড়ছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে খস্-খস্ শব্দ নির্জনতা ভাঙছে। দেখতে দেখতে গাছটা হেলে পড়লো। বাউলী পা টিপে এগিয়ে গিয়ে মূর্তিটার হাতে সজোরে একটা পোঁচ বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওঃ বাপ বলে মূর্তিটা লাফিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সে তখন জমিতে বসে হেলে পড়া গাছটার গোড়ায় মাটি দিতে লাগলো।

পূবকোণে যখন লালছটা। হাত ঝেড়ে বাউলী উঠে দাঁড়ায়। ওর চোখে ভেসে ওঠে নিথর শায়িত মূর্তি……মাছ-ধোয়া জল……জলের তোড়। তলপেটের ক্ষত চিহ্নের ওপর সে একবার হাত রাখে। তারপর চারা গাছ দুটোর পল্লব গুলো দুহাতে কাছে টেনে গালে চেপে ধরে। খানিক পরে ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। চোখের সবুজ জমিতে হেমন্তের শিশির জমতে শুরু করে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় গাছ দুটির কচি ডগা গুলো ওর দিকে নুয়ে এলো। □

পেতে গেলে কিছু ভাঙতে হয়। ভাঙার ভয়ে না পেয়ে পেয়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যুবতীর এই বাক্যবিন্যাস ভবু মানতে পারে নি অথবা বুঝতে পারেনি। কিন্তু কিছু বললোনা। কারণ সেই সীমানা বোধ—এই চিন্তা যুবতীর। ভবুর সীমানার বাইরে। তবে একটা জিনিস ও বুঝতে পারলো ভূখণ্ড দখল করতে গেলে বিয়েটা করতেই হবে। একবার ভাবার চেষ্টা করেছিলো বিয়ে যদি না করে। ভূখণ্ড যদি তলিয়ে যায়। ক্ষতি কি। কিন্তু ভাবনাটা কেন যেন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তাই রেজিষ্ট্রি করার সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললো।

রেজিষ্ট্রিতে কয়েকজন সাক্ষী লাগে। ও বন্ধুদের কাছে গেল, বন্ধুরা সব দারুণ খুশি। অরূপ পিঠ চাপড়ে বললো, সই সাবুদের পর অম্বরে খাওয়াতে হবে গুরু। ভবু একটা প্রস্তাব প্রায় দিয়েই ফেলেছিলো— ওদিন সবাই মিলে যদি না খাই ক্ষতি কি। অরূপের খিস্তির ভয়ে সামলে নিলো। এ সময়ে ও হয়তো আবার যুবতীকে নিয়ে টানাটানি করবে।

রেজিষ্ট্রির দিন সবাই খুব হৈ হৈ করলো। একফাঁকে যুবতী একটু কেঁদেও নিলো। সবাই তখন হামলে পড়ে সান্ত্বনা দিতে। মন খারাপ করে কি হবে। বাবা মার সাথে এ চির দেওয়াল তো চেয়েছিলে। এরকম সব অনেক কথা, খুব বিরক্ত লাগছিলো ভবুর। যুবতীর কান্না দেখে, বন্ধুদের যতসব বোকা বোকা সান্ত্বনামালা শুনে। কেন যে এত নিষ্ফল কথাবার্তা একটা মামুলি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওরা এত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করছে। বিমল ওর পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললো, এবার বুঝবি সীমানাটা কোথায়। তোর ক্ষতি আর অক্ষতির হিসেব এবার পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওকে দেবার জন্য একটা খিস্তি জিভের ডগায় এনে কিছুক্ষণ চুষে আবার গিলে নিলো ভবু। ভয় পেলো, হয়তো ওরা সবাই তখন দল বেঁধে ওর ছুঁড়ে দেওয়া চোষালো খিস্তির লালা মাখিয়ে ভবুকে চটচটে করে ছেড়ে দেবে। বিমল যখন

কথা বলছিলো যুবতীর তখন কী গুমোর, যেন সব হিসেব ওই বোঝাবে। সন্ধের আগে আগেই সই-সাবুদ, অম্বরে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে ওরা সবাই ভবুর একঘরা ফ্ল্যাটে ফিরলো। আরও কয়েক গোছা বিছানা সংক্রান্ত ইয়ার্কি মেরে এবার তবে চলি রে, এবার আসি, করতে করতে আরও কিছুটা সময় কাটিয়ে একসময় ফিরে গেলো। তারপর যুবতী ও ভবু মুখোমুখি, যুবতীর মুখ চকচক করছিলো। এগিয়ে এসে ভবুর হাত ধরে বললো, চলো, আমরা একটু জানলার ধারে বসি। ও বাধ্য ছেলের মতোই বসলো। এই ঘর সম্পূর্ণত ওর সীমানায়। এখানে ওকে বসতে বললে বসতে পারে। শুতে বললে শুতে পারে, এমন কি কেউ কিছু না বললেও ও এখানে কখনও কখনও গান গায়। নাচে। বোধ হয় স্বপ্নও দেখে। যুবতী বসার আগে জানালাটা খুলতে গেল অ্যাই, অ্যাই, কী করছো। জানলাটা খুলছি ভবু। এসময়ে একটু আকাশ থাকুক। বলতে বলতে বাধা দেবার আগেই জানালাটা খুলে ফেলে আকাশের নীল খুঁজতে লাগলো। কিন্তু জানালাটা একটা বাড়ির পিছন দিকে। দেখা গেল এক পুরোনো ছাতা ধরা দেওয়াল বেয়ে নেমে এসেছে ফাটা স্যানিটারি পাইপ।

স্যানিটারি দুর্গন্ধে ঘরটা ভলকে উঠলো। তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে যুবতী নাক কুঁচকে বলে উঠলো—ছিঃ। আগে বলতে পারনি, বলার আগেই তো খুলে ফেললে। তবে ক্ষতি কী। সেই তুমি এবং আমি, গন্ধতো কিছু পাল্টে দিতে পারলো না। তাছাড়া ঐ বাড়িটা আমার সীমানার বাইরে। যুবতী বেকুব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হয়তো একটু ভয়ই বা পায়। বেকুব যুবতীকে দেখে ভবুর নিজেকে হঠাৎ কেমন জন্তু জন্তু মনে হচ্ছিলো। এমন ভাবে ওকে দেখার আর কি-ই-বা কারণ থাকতে পারে।

যুবতী আর বসলো না। উঠে পড়লো। ঘরটা এলো মেলো হয়ে রয়েছে। আলনায় পাজামার উপর পাঞ্জাবী। তার ওপর গামছা।

গামছা ছুঁয়ে সোয়েটার। সোয়েটারের হাতের তলায় চাপা পড়ে আছে ইস্ত্রী করা জামা প্যান্ট। তার ওপরে নোংরা জাঙ্গিয়া। গোছাতে গোছাতে যুবতী বললো, আজ আমাদের বিয়ে। ঘরটাকে একটু গুছিয়েও রাখনি। ভবুর খুব হাসি পেয়ে গেলো। বিয়ের সাথে ঘরের কী সম্পর্ক। কিন্তু কিছু বললো না। হাসলোও না। তখন যুবতী হয়তো আবার চোখের মধ্যে টাঙিয়ে নেবে "সাবধান, জন্তু সামনে" সাইন বোর্ড।

রাত আর একটু গভীর হলে যুবতী বিছানা ঝেড়ে মশারি টাঙিয়ে মুখে মাখলো ক্রীম। রাত্রি-বেশে চেলে নিলো সুগন্ধি। ভবু শুধু বসে বসে দেখলো আর সিগারেট খেল। যুবতীর জন্য ওর খুব করুণা হচ্ছিলো। এমন করুণা ওর পারিপার্শ্বিক সব মানুষের জন্য হয়। মানুষেরা জীবন ভর এত নিস্ফল কাজ করে যায়। যুবতী ডাকলো, ভবু। মুখে অদ্ভুত হাসি ছড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, নাইট ল্যাম্প কোথায়। মাথা নাড়লো ও। নেই। তোমার অন্তত একটা নাইট ল্যাম্প লাগানো উচিৎ ছিলো। বলে যুবতী বিছানায় গিয়ে ঢুকলো। ঘরে জ্বলছে ষাট-ওয়াটের বাল্ব। বিছানায় শুয়ে যুবতী আবার ডাক দিলো, ভো-বুউ। ভবু তখন বিছানায় শুয়ে ভাবতে শুরু করে, বিয়েটা তাহলে হয়ে গেলো। কত কথা বলে মানুষ বিয়ে নিয়ে। অথচ কৈ, তেমন কি। বিয়েটাও কি তবে সেই নিস্ফলতার ধারায় আর একটু সংযোজন। তখন যুবতী মশারির ছাদের দিকে তাকিয়ে আবার ডাকলো ভো-বুউউ। ডাকের সাথেই ভবুর নাকে ধেয়ে এলো যুবতী শরীর ও শরীরে মাখা সুগন্ধির বাতাস। ও হাত বাড়িয়ে যুবতীর কপাল ছুঁলো। হাতটা ফিরিয়ে নাকের কাছে এনে ও অধিকৃত ভূখণ্ডের সোঁদা গন্ধ পেতে চাইছিলো, দেখলো হাতটা কেমন ভেজা ভেজা। অবাক ভবু যুবতীর দিকে তাকালো। যুবতীর কপাল গলে গেছে। গলে গলে জল হয়ে বইছে অবিরল। ও আবার কপাল ছুঁতে চাইলো। কপাল নেই। জল। সন্তর্পনে জল থেকে হাত বাঁচিয়ে ও যুবতীর চোখ, নাক, কান, ঠোঁট সমগ্র মুখাবয়ব হাতড়াতে

থাকলো। আর গলে যেতে লাগলো যুবতী-প্রত্যঙ্গ। অবাক হয়ে দেখছিলো ভবু ওর ছোঁয়ায় কেমন জল হয়ে যাচ্ছে ওর যুবতী। মোহাবিষ্ট ভবু ছুঁয়ে যাচ্ছিলো যুবতী-কণ্ঠা, স্কন্ধ, স্তন, নাভি, তলপেট, যোনি, জংঘা, পা। আর প্রতিটি অঙ্গই গলে যাচ্ছিলো। বইছিলো দৈর্ঘ্য তরঙ্গে। ওর বিছানা জুড়ে যুবতী তখন জল থৈ থৈ নদী। জ্যোৎস্নাময়ী। চিক্ চিক্। ত্বপার উপচে জল ভাসি। ভবু তখন ভাবলে সর্বনাশ। ভেসে যাই যে। ও তখন সাঁতার দিলো। সাঁতার দিলো আর মনে মনে বার বার বলতে লাগলো সর্বনাশের ভরা নদী। নদী। নদী।

বিয়ে করে ভবুর কাজ বাড়লো। আগে অফিস যাবার জামা প্যান্ট পরে একেবারে হোটেলে খেয়ে বাস ধরতো। এখন রোজ সকালে পাজামা পাঞ্জাবী পরে বাজার যায়। পুঁই ডাঁটা কেনে। যুবতীকে একদিন প্রস্তাব দিয়েছিলো এসব ঝামেলা না করে ত্বজনে হোটেলে খেলেইতো হয়। যুবতী এক ধমক দিয়ে বললো, বিয়ের পরেও হোটেল। ভবু ভাবলো, তবে বিয়ে মানে বাড়িতে রান্না পুঁই-চচ্চড়ি আর ছুঁয়ে দিলেই নদী।

ভবু রোজ চা খায়। ভাত খায়। অফিস যায়। বাড়ি ফেরে, রাতে নদী, নদী বাড়ে বিড়বিড় করে। একদিন সব বন্ধুরা ওদের বাসায় এলো। কিরে, কেমন বুঝছিস। বিয়ে করে একেবারে উবে গেলে যে বাবা। এর নাম বিয়ে বুঝলি। ভবু মনে মনে বিমলকে কাঁচকলা দেখালো।

পরদিন ভবু চা খেলো। ভাত খেলো। অফিস গেলো। সোজা বাড়ি ফিরলো না। ময়দানে গিয়ে বসে রইলো। ময়দানে বসে ওর বেশ অন্যরকম ভালো লাগছিলো। রেড রোড ধরে গাড়িগুলো ছুটছে, যেন সার সার ছুটন্ত হেডলাইট আর টেললাইট। মাঠের আধো অন্ধকারে ঘুরছে বিগত যৌবনা বেশ্যা, ঘুরছে দালাল। বেবী-ফুড আঁকড়ে ধরে আসছে মাঝবয়সী খদ্দের। আর তাদের ঘিরে জাল টানছে ছুটকো

মস্তান আর পুলিশি ফ্রন্ট। কেমন এক আধা আঁধারি জীবন। একটু রাত করে ভবু বাড়ি ফিরলো। যুবতী জিজ্ঞেস করলো বন্ধুদের কাছে গিয়েছিলে। কাতর ভাবে বললো, বলে যাবেতো। চিন্তা হয়। রাস্তায় কত কিছু হতে পারে। অ্যাকসিডেন্টের খবর শুনি। ভবুর ভালো লাগে। বিয়ের একটা নতুন মানে খুঁজে পায়। আবার কেমন এক ভয়ও বাসা বাঁধে শরীরে কোথাও। সত্যিই যদি কোনদিন তার অ্যাকসিডেন্ট হয়। অ্যাকসিডেন্ট তো কেউ কামনা করেনা। অন্তত নিজের। তবুও হয়। এরপর থেকে অ্যাকসিডেন্টের খবর শুনলেই ও একটু উৎকর্ণ হতো। যদিও অ্যাকসিডেন্ট গুলো ওর সীমানার বাইরে। তেমন কিছু নিয়ে উৎকর্ণ হওয়া ওর স্বভাববিরুদ্ধ। ময়দানের আঁধারিতে বসে ও ভাবে, এই অ্যাকসিডেন্টের খবর যুবতীর কানে পৌঁছেছে কিনা। পৌঁছালে যুবতী দুশ্চিন্তায় কতটা কাতর হয়েছে। কিন্তু প্রায় কোন খবরই পৌঁছায় না। ভবুর দেরিতে ফেরা অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই কাতরও হয়না। আজকাল ভবু সোজা বাড়ি ফেরে। যেদিন প্রথম সোজা বাড়ি ফিরলো যুবতী একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এত তাড়াতাড়ি। ভবু একটু খুশি হলো, কিন্তু পরের দিন যুবতী আর কিছুই জিজ্ঞেস করেনা। ভবুও একই রকম। বাজার করে। খায়। অফিস যায়, বাড়ি ফেরে। ঘরে নাইট ল্যাম্প কেনা হয়েছে। থৈ থৈ নদী আর জ্যোৎস্নাময়ী হয়না।

ভবু শুধু অ্যাকসিডেন্টের খবর শোনে। অধিকাংশ ঘটনাই দূরে দূরে। একদিন ওর এক সহকর্মী ট্রেনে কাটা পড়া এক যুবতীর কথা বললো। ভবু ভাবলো, আমার ঘরের ওপর দিয়ে কোনো ট্রেন যায়না। আর একদিন পাতাল রেলের এক শ্রমিকের ক্রেনে চাপা পড়ার খবর শুনে ও বিকেলে চৌরঙ্গিতে গিয়ে ক্রেনটাকে চুপিচুপি চিনে আসার চেষ্টা করেছিলো। আর রোজই বাড়ি ফিরেছিলো।

যুবতী এখন ওকে ভয় পায়। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, তোমার কোনো

ইচ্ছে নেই। ভবু মনে মনে বলে অ্যাকসিডেন্ট, কিন্তু যুবতীকে কোনো শাব্দিক উত্তর দেয় না। বন্ধুরা ওদের বাড়িতে আসা ছেড়ে দিয়েছে। যুবতীও মাঝে মাঝে ভাবে, মানুষ বিয়ে করে কেন। এইসব একঘেয়ে ঘটনাবলীতে ভবুর ভূমিকা কি ? যুবতীর নিজের ভূমিকাই বা কতটুকু। একদিন অফিস বের হবার সময় যুবতী তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিলো। বললো, আজ আমায় একটু বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। একটু কেনাকাটাও আছে। ভবুর ইচ্ছে ছিলোনা। বেড়াতে গিয়ে কোনো লাভ নেই। কিন্তু না গিয়েও কোনো লাভ নেই বলে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ালো। এমন সময় একটু দূরে তাকিয়ে দেখে কিছু একটা ঘেরাও করে এক দঙ্গল লোক জটলা করেছে। ঘটেছে কিছু। এগিয়ে গিয়ে দেখবে কিনা ভাবছিলো ভবু, এমন সময় ভিড় থেকে ছিটকে এসে ওর সামনে পড়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো একজন সন্ত্রস্ত লোক । ও লোকটিকে জিজ্ঞেসে করলো দাদা, কী হয়েছে। দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠলো লোকটি—ইস্, ভাবা যায়না। একদম আপনার মতো। ধক করে ওঠে ভবুর বুক, একদম তার মতো—কী। লোকটি বলে চলে, ঠিক আপনার মতো নীল জিনস্ চেক শার্ট পরা প্রায় আপনাদেরই বয়সী একটা ছেলেকে ট্রাকে চাপা দিয়ে গেলো। তীরের মতো ছিটকে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ভবু। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল কষ্ট হয়। একটু বাতাস চাই। আর একটু বাতাস। চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো। ঠিক ওরই মতো। ও নিজে নয়তো। সেই মাত্র থর থর শেষ কম্পনে নিথর হয়ে গেলো ভবুরই বয়সী এক যুবকের দুটি নিটোল পা। শরীরটার মুখের দিকে চাইলো—ভবু। তারপর বুক ভরে বাতাস টেনে নিঃশব্দ উচ্চারণে বললো—নাঃ—আমি নই। ওর শ্বাস কষ্ট কমে আসে। এক দুর্বোধ্য বোধ ওকে ছুটিয়ে নিয়ে আসে ওর বাড়ির দরজায়। স্বভাব বিরুদ্ধ জোরে কড়া নাড়ে।

দরজা খুলে ওকে দেখে যুবতীর দুচোখ প্রশ্নালু। ভবু বললো, যুবতী নদী হও।
যুবতী প্রথমে অবাক পরে খুশি হলো। বেড়াতে যাবার বায়না ছেড়ে নদী হলো। ভবু তখন আকুল সাঁতার দেয়, নিজেকে মথিত করে। যুবতী তখন একটু ভয় পায়। এ যেন অন্য ভবু। জিজ্ঞেস করলো তোমার কী হয়েছে। ও বললো, অ্যাকসিডেন্ট, যুবতীর ধন্দ লাগে। ভবু বললো, আমারও তো হতে পারতো। একইরকম নীল জান্স। চেক শার্ট, বয়স। কিন্তু আমি এখনও জীবনের সীমানায়, দেখ, বলে যুবতীর হাত চেপে ধরলো নিজের বুকের মধ্যে।
তার পরদিন থেকে ও আবার থিতিয়ে আসতে শুরু করে, আগের মতোই অফিস-খাওয়া-ঘুম। প্রথম দু একদিন অ্যাকসিডেন্টের জায়গাটায় গিয়ে কেউ যাতে বুঝতে না পারে তেমন করে চোরের মতো দেখতো। আর জোরে জোরে শ্বাস টেনে বুকের ভিতর চলমান প্রাকৃতিক হাপরটাকে ছুটিয়ে বেঁচে থাকার শব্দ বুঝতে চাইতো। একদিন যুবতী বললো, অ্যাই। তারপর লজ্জা পেলো। ভবু লজ্জা ভাঙ্গানোর মতো কোনো প্রশ্নই করলোনা। তখন যুবতী বললো, আমি। ভবু মনে মনে বললো হ্যাঁ, তুমি, তুমি কী। যুবতী বাধ্য হয়েই বললো—মা হচ্ছি। ভবু কিছুই বললো না। যুবতী নিরাশ হয়। ও একটু উচ্ছ্বাস আশা করেছিলো। ভবু মনে মনে বললো, পৃথিবীতে লক্ষ মানুষী রোজ মা হয়। তাতে কী।
দিন যায়, মাস কাটে। যুবতী অলস হয়। স্ফীত হয়, ভবু তাকিয়ে থাকে 'নির্বিকার'। যুবতী ডাক্তার দিয়ে প্রাথমিক চেক আপ করাতে গেলে ভবু সঙ্গে যায় ঠিকই। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে যুবতীকেই সমস্ত কথা বলতে হয়। চেম্বারের ভিড়ে ভবু যেন এক অচেনা মানুষ। নির্ধারিত সময় হয়ে এলে যুবতী ওর ওপর আর আস্থা রাখতে পারলো না। ভবুকেই অনুরোধ করলো, বন্ধুদের খবর দাও। ভবু ভাবলো বন্ধুরা কী করবে। অবশ্য খবর দিলো। ওরা ভবুকে চেনে। ওকে

কোনো প্রশ্নই করলো না। যুবতীর সঙ্গে কথা বলে হাসপাতাল ঠিক করলো। ভর্তি করে দিয়ে বিকেল থেকে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রইলো লেবার রুমের সামনের উৎকণ্ঠিত উঠোনে। ভবুও ওদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকলো। ওর ভালো লাগছিলো না। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা খুব বোকা বোকা, নিষ্ফল। লেবার-রুম এবং যুবতীর প্রসব দুটোই ওর সীমানার বাইরে। লেবার-রুম থেকে কেউ বের হলেই বন্ধুরা খবরের জন্য ছুটে যায়। শুনে এসে ওকে বলে, আর একটু। ভবু বিরক্ত হয়। এভাবে খবরের জন্য ছোটা আর ফিরে এসে আর একটু বলার কোনো প্রয়োজন আছে কি। এতে কি প্রসব তাড়াতাড়ি হবে। সময় যত পার হয়, বন্ধুরা ছটফট করে। ভবু তত নিস্তেজ হয়, রাত তখন গভীরতার দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। উত্তেজনায় ঝিমিয়ে আসছে বন্ধুরা। তখন একজন দাঁতে-মিশি আয়া এসে বললো, টাকা দাও খবর দেবো। ভবু পকেটে হাত দিলোনা দেখে অরূপ তাড়াতাড়ি পাঁচটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে সমস্বরে বলে উঠলো, বলো। ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে গো। বিমল ভবুকে ধাক্কা দিয়ে বললো, কি রে। ও বললো শুনলাম তো, অপিক্ষে করো। খানিক পরে দেখাবো – বলে আয়া আবার ঢুকে গেলো লেবার-রুম। একটু পরে সাদা চকচকে এনামেলের ট্রেতে করে ভবুর মেয়েকে নিয়ে এলো। সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখলো, বাঃ। ভবুর মেয়ে, ভবু দেখলো, রক্তরস মোছা এক ছোট্ট মানুষী। কৈ তেমন নড়ছে না তো। ওর বুকের মধ্যে কোনো কিছু যেন ধীরে ধীরে ডেলা পাকাতে শুরু করলো। ডেলাটা বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে চেপে বসছে বুকের গভীরে। এই মানুষী কি তবে জীবনের সীমানার মধ্যে নেই। এমন সময় এক পুরুষ কর্মী ওদের দিকে বাড়িয়ে ধরলো একটা প্রেসক্রিপশন। দুটো ওষধ খুব জলদি দরকার। একটা প্রসূতীর। অন্যটা প্রজন্মের। অরূপ হাত বাড়িয়ে নিতে গেলে ভবু ছোঁ মেরে কাগজটা নিয়ে নিলো। আমি চললাম বলে প্রায় ছুটতে শুরু করলো। বন্ধুরা চিৎকার করে বাধা

দিতে চাইলো। ভবু, ওষুধটা খুব দরকারী। ভবু তক্ষণে অদূরে দেওয়াল থেকে সাইকেল টেনে নিয়েছে, অরূপ ছুটে এসে ওর হ্যাণ্ডেল ধরে চিৎকার করে উঠলো, শালা, এখনও তোমার······। বলতে বলতে ভবুর চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলো। এ কোন ভবু, বহুদিন এর সাথে দেখা হয়নি। এর চোখের ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে জীবনপ্রেম হাসি। ও হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিলো। ভবু প্যাডেলে পা দিয়ে সিটের উপর চড়ে বসলো। সাইকেল তখন হাসপাতালের গেট ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়েছে, প্যাডেলে চাপ বাড়িয়ে হ্যাণ্ডেল বাঁদিকে ঘুরিয়ে প্রধান সড়কের উপর পড়লো, রাস্তার ঢালঢল এখন ওর চোখে পরিষ্কার হয়নি। বহুক্ষণ হাসপাতাল-চত্বরে হ্যালোজেন আলোয় চোখ সয়ে যাওয়ায় নাকি ওর চোখের নতুন ভালোবাসার দৃষ্টি, কি যে এর কারণ কে জানে। আর একটু জোরে প্যাডেলে চাপ দিলো ভবু, একটু আগে দেখা নবজাতক মানুষীর প্রায় নিস্পন্দনের ঘোর ওর তখনও কাটেনি। ঠিক তখনই বিকট শব্দে হর্ন দিয়ে একটা জীপ হুমড়ি খেয়ে ওর ওপর পড়ে ব্রেক কষে দাঁড়ালো। রাস্তার পাশের অলস নেড়ি কুকুরগুলো কুঁই করে সরে গেলো রাস্তার পাশের নর্দমার দিকে। গাড়িটা তখনও থর থর করে কাঁপছে। ভবু রাস্তাটা ভালো করে দেখে নিয়ে হ্যাণ্ডেল এদিক ওদিক ঘুরিয়ে গাড়িটা পার হয়ে গেলো। পিছন ফিরে দেখলো গাড়ির পিছনের লাল আলোটা। যেন ওকে রাগে থর থর করতে করতে ধমক দিচ্ছে। ভয় দেখাচ্ছে অ্যাকসিডেন্টের, ও আবার সামনেটা ভালো করে দেখে নিয়ে নিজেকে বললো, এখন আর কোন অ্যাকসিডেন্ট নয়। আমার পকেটে প্রেসক্রিপশন।